দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

শরৎচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী মানসিকতা তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রভাবিত করেছিল — পৃঃ ১৩

শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র স্মৃতির ভেলায় সাহিত্য রাজনীতি ও মূল্যায়নে — পৃঃ ১৫

৭৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।। ২৭ ভাদ্র, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

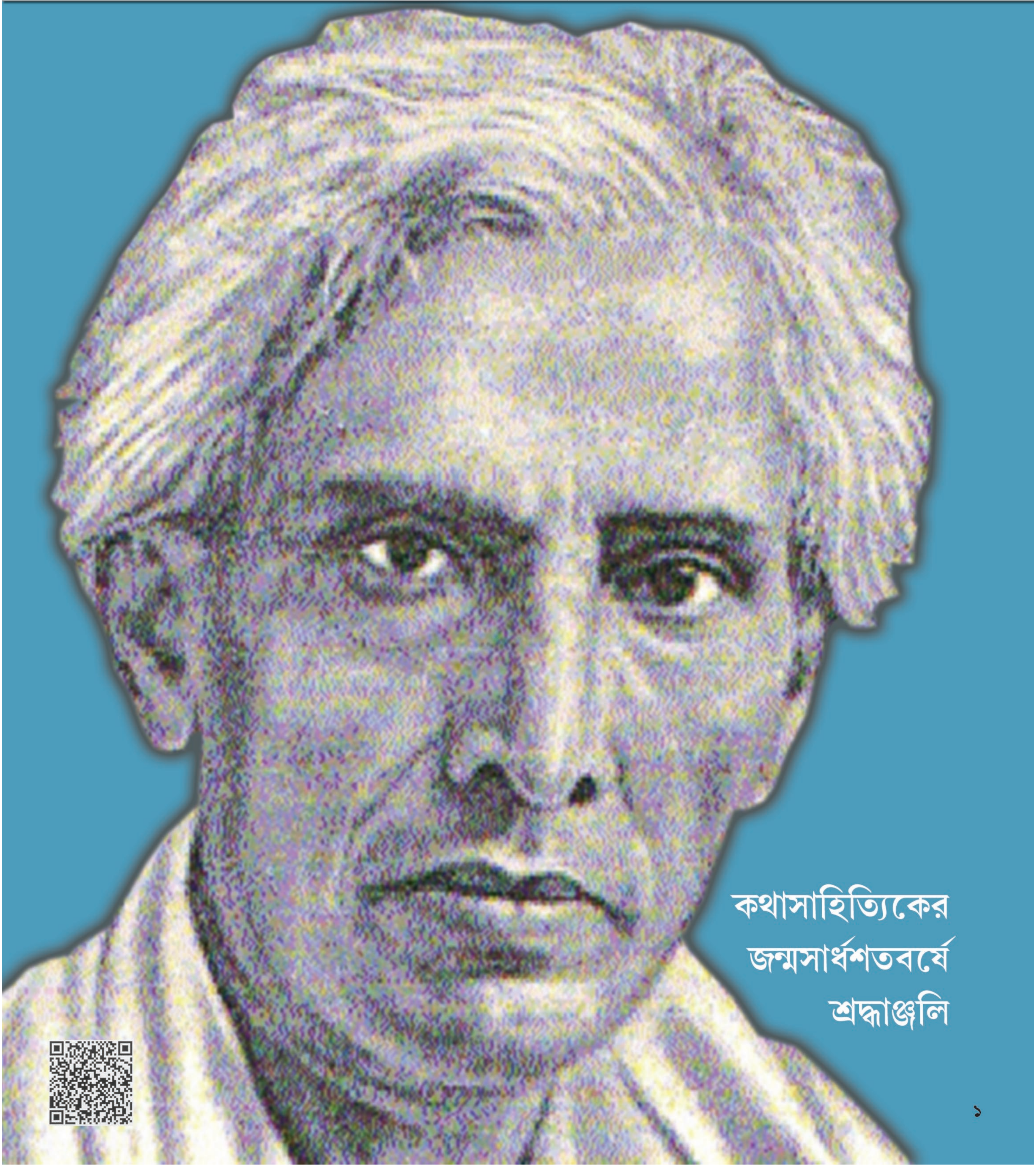

কথাসাহিত্যিকের জন্মসার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

कुटुंब प्रबोधन

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৯ বর্ষ ২ সংখ্যা, ২৭ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১৪ সেপ্টেম্বর - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

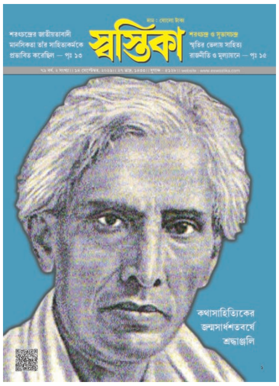

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

পরাজিতদের কোনো বিকল্প নেই তাই শৃগালের সঙ্গে সিংহের বন্ধুত্ব হয় না ‘দেউলিয়ার তরজা’ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

পূজার আগেই ধাক্কা দিদির! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

বিশ্বমননে ভারতের অদ্বৈত-ধ্বনি : নিউইয়র্কে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ◻ ডঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৮

ঊষর পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বকর্মার আগমন আসন্ন ◻ ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য ◻ ১১

শরৎচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী মানসিকতা তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রভাবিত করেছিল ◻ ডঃ বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ১৩

শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র : স্মৃতির ভেলায় সাহিত্য রাজনীতি ও মূল্যায়নে ◻ সৈকত নিয়োগী ◻ ১৫

শরৎচন্দ্র এক সংশয় কুণ্ঠিত সমীক্ষা ◻ অমিত দাস ◻ ১৭

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা লোকসাহিত্যে বিশাই ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও ঘুড়ির জন্ম ইতিহাস ◻ ডঃ সর্বাণী চক্রবর্তী ◻ ৩৪

পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ বিরোধী আন্দোলন ◻ সুভাষ চক্রবর্তী ◻ ৩৫

অতি শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হওয়া প্রয়োজন ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৩৯

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্য, সমাজ চেতনা ও জাতীয়তাবোধের অন্তর্লীন সেতুবন্ধন ◻ সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত ◻ ৪৩

পিতাশ্রী শ্রী ভঁওরলালজী মল্লাবত লাভ করেছিলেন ইচ্ছামৃত্যু ◻ অরুণ প্রকাশ মল্লাবত ◻ ৪৭

জিএসএলভি—এফ ১৭ : ভারতের মহাকাশ সক্ষমতার নতুন মাইলফলক ◻ সোমনাথ গোস্বামী ◻ ৪৫

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **অন্যরকম : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

প্রকাশিত হবে
২১ সেপ্টেম্বর
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২১ সেপ্টেম্বর
২০২৬

রাজ্য সরকারের ১০০ দিন নিয়ে বিশেষ সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার গত ১৭ আগস্ট তাদের ১০০ দিন পূর্ণ করেছে। নির্বাচনী সংকল্পপত্রে বা তাদের প্রতিশ্রুতিতে যা যা ঘোষণা করেছিল তা তারা পূর্ণোদ্যমে বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে। তাতে মানুষের ভরসার স্থল নির্মাণ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত সরকার মানুষের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পেরেছে, স্বস্তিকার আগামী ২১ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সেবিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক। এছাড়াও থাকবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্বস্তিকার প্রতিনিধিকে দেওয়া একটি একান্ত সাক্ষাৎকার। মূল্য : ২৫ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশিতম বর্ষে পদার্পণ করল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০, ০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) একসঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সার্ধশতবর্ষে অপরাজেয় কথাশিল্পী

বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পল্লীগ্রামের সমাজজীবনের টানাপোড়েনই তাঁহার উপন্যাসের মূল উপজীব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও মনে করিতেন সমাজ ও সমাজের বিধান ভিন্ন প্রকৃতির। দুইজনেই সেই দুইটিকে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন। শরৎচন্দ্র সর্বদা মনে করিয়াছেন সুস্থ সমাজ তাহার বিধানের অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে এবং অনেক বৃহৎ। তিনি তাঁহার রচনায় অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। রক্ষণশীল সমাজের নির্মম শাসনে জর্জরিত মাতৃজাতির কথা তিনি অতি সাহসের সহিত তুলিয়া ধরিয়াছেন। বাল্যবিধবা, বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণা এবং সমাজচ্যুত নারী ও পুরুষের মনোবেদনা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া তাহা লেখনীর মাধ্যমে মূর্ত করিয়াছেন। তাঁহার পল্লীসমাজ অথবা শ্রীকান্ত উপন্যাসে এই সকল জীবনের নিখুঁত বিবরণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন, দেশের নব্বই ভাগ মানুষ যেখানে বসবাস করিয়া থাকেন সেই পল্লীতেই তাঁহার গৃহ। মনের আগ্রহ, মনের কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বহুদিন তিনি তাহাদের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাদের দুঃখ-কষ্ট এবং বহু দৈন্যের সাক্ষী হইয়াছেন। মানব সমাজের বিশেষ করিয়া গ্রামগঞ্জের মানুষের দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, দলাদলি, কুরীতি, কুপ্রথা ইত্যাদি তাঁহার ন্যায় এত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় আর কাহারও লেখনীতে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার ছোটো গল্প, বড়ো গল্প, উপন্যাস পাঠ করিতে করিতে মন বেদনায় ভারাক্রান্ত অথবা দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া ওঠে নাই এমন পাঠক দুর্লভ। কথা সাহিত্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরসূরী হইলেও রবীন্দ্রনাথও তাঁহার রচনার গুণমুগ্ধ ছিলেন। বাংলাভাষায় তো বটে, বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় তাঁহার অনেক রচনার চিত্রনাট্য নির্মাণ হইয়াছে এবং তাহা দর্শক মনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাইয়া অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। শুধু সাহিত্যকর্মেই নহে, চিত্রাঙ্কনেও তিনি দক্ষতার পরিচয় রাখিয়াছেন। রেঙ্গুনে বসবাসকালে তাঁহার অঙ্কিত 'মহাশ্বেতা অয়েল পেইন্টিং' একটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম।

শুধু সাহিত্য কর্মের মাধ্যমেই নহে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে তিনি বিপ্লবীদিগের প্রেরণাদাতা ও আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি বিপ্লবীদিগকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেন। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, হেমচন্দ্র ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাস্টারদা সূর্য সেনের ন্যায় বিপ্লবীদিগের সহিত তিনি গভীর সম্পর্ক রাখিতেন। বাংলা সাহিত্য এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা সৃষ্টিকারী তাঁহার উপন্যাসটি হইল 'পথের দাবী'। এই উপন্যাসে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকা ও অবস্থানের বিষয় স্পষ্ট করিয়াছেন। উপন্যাসটি এতই প্রভাবী যে, প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসক পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত তিনি সক্রিয় রাজনীতিতেও যুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দিয়া তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার অত্যন্ত আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খিলাফত আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহা হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নহে, অসত্যও বটে'। তাঁহার স্বচ্ছ চিন্তার জন্যই সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহাকে শুধু শ্রদ্ধাই করিতেন না, তাঁহার নিকট হইতে রাজনৈতিক পরামর্শও গ্রহণ করিতেন। তোষণনীতির কারণে কংগ্রেসের যখন নীতিপঙ্গুত্ব শুরু হইয়াছে, তখন তিনি 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধ রচনা করিয়া কংগ্রেসকে সতর্ক করিয়াছিলেন, যাহা বর্তমান সময়েও সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁহার জন্মসার্ধশতবর্ষে স্বস্তিকা পত্রিকা তাঁহাকে বিনম্র শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করিতেছে।

সুভাষিতম্

অভয়স্যৈব যো দাতা তস্যৈব সুমহৎফলম্।
ন হি প্রাণসমং দানং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।।

অর্থ ঃ জীবন ও অভয় প্রদানের চেয়ে বড়ো কোনো দান নেই। যিনি তা প্রদান করেন তিনি এই তিনলোকে সর্বোচ্চ পুণ্য অর্জন করেন।

বিরোধীরা এরাজ্যে গুরুত্বহীন : শৃগালের সঙ্গে সিংহের বন্ধুত্ব হয় না

দেউলিয়ার তরজা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রকার সের্গেই আইসেনস্টাইন তার নির্দেশিত 'ব্যাট্‌ল্‌শিপ পোটেমকিন' সিনেমায় একটি সাব-টাইটেল ব্যবহার করেছিলেন— 'অল্ এগেইনস্ট ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান এগেইনস্ট অল্', অর্থাৎ একজনের বিরুদ্ধে সবাই আর একজন সবার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্যত। রাজ্যের রাজনীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির বর্তমানে সেই অবস্থা। তার সমকক্ষ কেউ নেই। এই মুহূর্তে তার সমকক্ষ হয়ে ওঠা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভবও নয়। মনে হয় আগামী কয়েক দশক রাজ্য শাসনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। সে ধরনের দৃঢ়চেতা মানসিকতা নিয়েই তারা কাজ শুরু করেছে। অন্তত ২০৪৭ (ভারতীয় স্বাধীনতার শতবর্ষ) পর্যন্ত দেশজুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির রথ কিছুতেই থামবে না। কথাটা ভাবলে হয়তো বিরোধীদের দুশ্চিন্তা বাড়বে। পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেসের মতো দলের উত্থান-পতন অনেকটাই কেন্দ্র নির্ভর। একটি সাম্প্রতিক সর্বভারতীয় সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী--- এখন যদি দেশে লোকসভা নির্বাচন হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৬টি আসন পাবে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং গোটা দেশে তারা ৩২৬টি আসন পাবে। আপাতত কেন্দ্র বা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতা থেকে সরাবার কোনো রাজনৈতিক শক্তি নেই।

এরাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিরোধীরা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। রাজ্যের ভোট রাজনীতিতে কংগ্রেস-সিপিএম অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তস্কর দলও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে তাদের হাতে পড়ে রয়েছে গুটিকতক সাংসদ আর বিধায়ক। আপাতত নিজেদের পিঠ বাঁচাতে তারা বিভিন্ন আইনি আর রাজনৈতিক দরজায় ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরছে। কলকাতা পুরসভা-সহ রাজ্যের সব পৌরসভার নির্বাচন যত এগোচ্ছে, তাদের তরজা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে কলকাতা পুরভোটের আগে তাদের দেউলিয়াপনার সে চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভোটের পর তারা হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আগামী জানুয়ারিতে রাজ্যের ১২৪টি পৌরসভার ভোট রয়েছে। গণতন্ত্রের অন্যতম সোপান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে যে, ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা ভোট শেষ হওয়ার পর এরাজ্যে বিরোধীরা প্রায় কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে। যদিও তাদের যৌথ ভোটের পরিমাণ প্রায় ৫২ শতাংশ। আগামী নির্বাচনগুলিতে তারা যে সেই ভোট ধরে রাখতে পারবে না, তা সহজেই বলে দেওয়া যায়।

ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যথার্থ বলেছেন যে, এরাজ্যে এই মুহূর্তে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা খুলে নেওয়ার মতো কোনো বিরোধী নেই, অর্থাৎ রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক থেকে বিরোধীরা কোনোভাবেই ভারতীয় জনতা পার্টির সমকক্ষ নয়। সিংহের সঙ্গে শৃগালের বন্ধুত্ব হয় না।

এবারের রাজ্য বিধানসভা ভোটে প্রায় ৪৭ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকারে ক্ষমতাসীন হয়েছে ভারতীয় জনত পার্টি। ২০৩১-এর রাজ্য বিধানসভা ভোটে মুখ্যমন্ত্রী ৬০ শতাংশ ভোট প্রাপ্তির টার্গেট রাখছেন। পূর্বতন শাসক দলের চণ্ডনীতি ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে এবারের রাজ্য ভোটে কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তাতে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল জয় সবরকম অনিশ্চয়তা মুছে দিয়েছে। আগামী ভোটগুলিতে সে অনিশ্চয়তা আরও মুছে যাবে। বিভিন্ন নির্বাচনে আসন প্রাপ্তির অঙ্কে বিরোধীরা হয়তো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যেতে পারে। কলকাতা পুরভোট আর বিভিন্ন পৌরসভার ভোটেই তা প্রমাণ হবে। এরাজ্যের নবনির্বাচিত সরকারের ৩ মাস কেটে গিয়েছে। তবে পূর্বতন তস্কর সরকারের প্রতি মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এতটুকু কমেনি। এখনও রাজ্যের অনেক এলাকায় তস্কর সরকারের তোলাবাজ আর সমাজবিরোধীরা ধরা পড়ছে। রাজ্যের সব ভোটারের প্রতি সরকারের দায়িত্ব-কর্তব্য সরকারেরই পালনীয় বিষয়। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বিরোধীরা খড়-কুটো ধরে ভেসে থাকতে চাইছে। ভারতীয় জনতা পার্টি গৃহীত রাজনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী— এরাজ্যের সমস্ত ভোট এককভাবেই তারা লড়বে ও জিতবে। অন্য কোনো রাজনৈতিক দল এরাজ্যে নেই যার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি আগামীদিনের নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক জোট গড়তে পারে। ভারতীয় জনতা পার্টির সমকক্ষীয় কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক দল আগামী কয়েক দশকে এরাজ্যে তৈরি হওয়া আপাতত অসম্ভব। কিছু ছিঁদেল, রাজনৈতিক সুবিধাবাদে বিশ্বাসী বিরোধী নেতা নানা প্রক্রিয়ায় বৈতরণী পারের পরিকল্পনা করলেও তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হবে। তা রইবে কেবল তাদের কল্পনার স্তরেই। তাই তারা কোনো সুবিধাই করতে পারবে না। জনমানসে এই বিষয়টি সম্পর্কে অপপ্রচারে সক্রিয় রয়েছে একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম। তাদের সবরকম অপপ্রয়াস জারি থাকলেও বলা যায় যে, দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বিরোধীদের ফেরার কোনো রাস্তা নেই।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

পূজার আগেই ধাক্কা দিদির!

পতনেষু দিদি,

পূজার আগেই ফের ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ল পশ্চিমবঙ্গে। আর সেই সঙ্গে নতুন সঙ্কট দেখা দিল আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেসে। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ও মুর্শিদাবাদের রেজিনগর, এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তামিলনাড়ুর দু'টি, পুদুচেরি ও অসমের একটি করে বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জোড়া কেন্দ্রেও উপনির্বাচন হবে আগামী ৬ অক্টোবর। ফল ঘোষণা হবে ৯ অক্টোবর। উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

রাজ্যে জোড়া উপনির্বাচনের জন্য বেশ কিছু দিন ধরেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে শাসক বিজেপি। একই সঙ্গে ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম, দুই কেন্দ্র থেকে বিধানসভা ভোটে জেতার পরে পূর্ব মেদিনীপুরে নিজের পুরনো আসন ছেড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আপনাকে নন্দীগ্রামের পরে ভবানীপুরেও হারিয়েছেন শুভেন্দুবাবু। গতবারের হারের ক্ষত নিয়েও ভবানীপুরে উপনির্বাচন বাঁচিয়েছিল আপনাকে। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই ঘরে বসে থাকা ছাড়া।

আপনার ভাইপোর উপরে না আমার খুব রাগ হয়। চিরকাল সুখের পায়রা থাকা ভাইপো ঠিক আপনার নতুন বিপদের দিনে তিনি ফুড়ুৎ করে বিদেশে উড়ে গেছেন। কবে আসবে বা আদৌ আসবেন কি না তা নিয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই সময়ে কি না গেলেই হতো না। বিধানসভা ভোটের পরে ফলতার পুনর্নির্বাচনে বড়ো জয় পেয়েছে বিজেপি। এবার নিজের ছেড়ে দেওয়া আসন নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন ফলতার থেকেও বড়ো ব্যবধানে জিততে হবে বলে দলকে বার্তা দিয়ে রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেটা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। আর তাতে বিজেপির বিধানসভায় শক্তিও বাড়বে না। ২০৮-ই থেকে যাবে।

কিন্তু দিদি রেজিনগরে কী হবে! আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীরের মানে আপনার এক সময়ের চোখের মণি ভাইয়ের জেতা দ্বিতীয় কেন্দ্র রেজিনগর (নওদা রেখে যেটি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি) আসনেও বিরোধীদের ভোট বিভাজনের জেরে জয়ের রাস্তা খুঁজছে পদ্ম শিবির। সেখানকার অঙ্ক তো আবার আপনিই মানে আপনার দলই সহজ করে দিয়েছে।

সেই সঙ্কট। সঙ্কট দেখা দিয়েছে তৃণমূল শিবিরে কে 'আসল' তৃণমূল তা নিয়ে। এই প্রশ্নের ফয়সালা এখনো করেনি কমিশন! প্রতীক কার দখলে থাকবে, সেই প্রশ্ন এখনো ঝুলে। তার মধ্যেই উপনির্বাচন ঘোষণা। এমতাবস্থায় প্রার্থী ঠিক করার জন্য দুই শিবিরকেই জরুরি ভিত্তিতে আলোচনায় বসতে হচ্ছে। যা শুনছি, প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দুই গোষ্ঠীই! একই দলের নামে দু'জন করে প্রার্থী— এমন পরিস্থিতি এ রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে কার্যত বেনজির!

রেজিনগরে বহুমুখী লড়াই। মুসলমান ভোট ভেঙে খান খান। বিজেপি কিন্তু ২০৮ থেকে ২০৯ হওয়ার জন্য তাল ঠুকছে দিদি।

কালীঘাটপন্থী মানে আপনার কথায় 'আসল' তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'আমরা তো প্রার্থী দেবই। নির্বাচন কমিশনের কাছে দু' তরফের আবেদন জমা রয়েছে। এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। এই অবস্থায় আইন মোতাবেক দলীয় প্রতীক দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই।' বেগতিক বুঝে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের শিবির তাদের দাবির দ্রুত মীমাংসা চেয়ে কমিশনের উপরে চাপ বাড়াতে চাইছে। উপনির্বাচন ঘোষণার পরেই সোমবার সন্ধ্যায় মেট্রোপলিটনে তৃণমূলের দপ্তরে কৌশল ঠিক করার বৈঠকে বসেছিলেন ঋতব্রতরা। বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলায় বিদ্রোহী তৃণমূলের লোকজন আছে, জেলা সভাপতি হিসেবে আছেন প্রাক্তন বিধায়ক অপূর্ব (ডেভিড) সরকার। কিন্তু স্বয়ং শুভেন্দুবাবুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে ঋতব্রতদের তেমন সাংগঠনিক অস্তিত্ব নেই। ফলে, সেখানে দিদি আপনার সঙ্গেই বিজেপির লড়াই। আবার হারতে হবে। আর সেটা পূজার আগেই।

দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনেই প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সিপিএম। তবে নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে বাম শরিক সিপিআইয়ের দাবিও আছে। অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস নন্দীগ্রামের জন্য পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিয়েছে রণজিৎ মুখোপাধ্যায়কে। তবে অধীর চৌধুরীর জেলায় রেজিনগরের ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের মতোই গুরুত্ব পাবে বলে সূত্রের খবর। সেখানে হুমায়ুনও নিশ্চয়ই প্রার্থী দেবেন। ফল— বহুমুখী লড়াই। মুসলমান ভোট ভেঙে খান খান। বিজেপি কিন্তু ২০৮ থেকে ২০৯ হওয়ার জন্য তাল ঠুকছে দিদি।

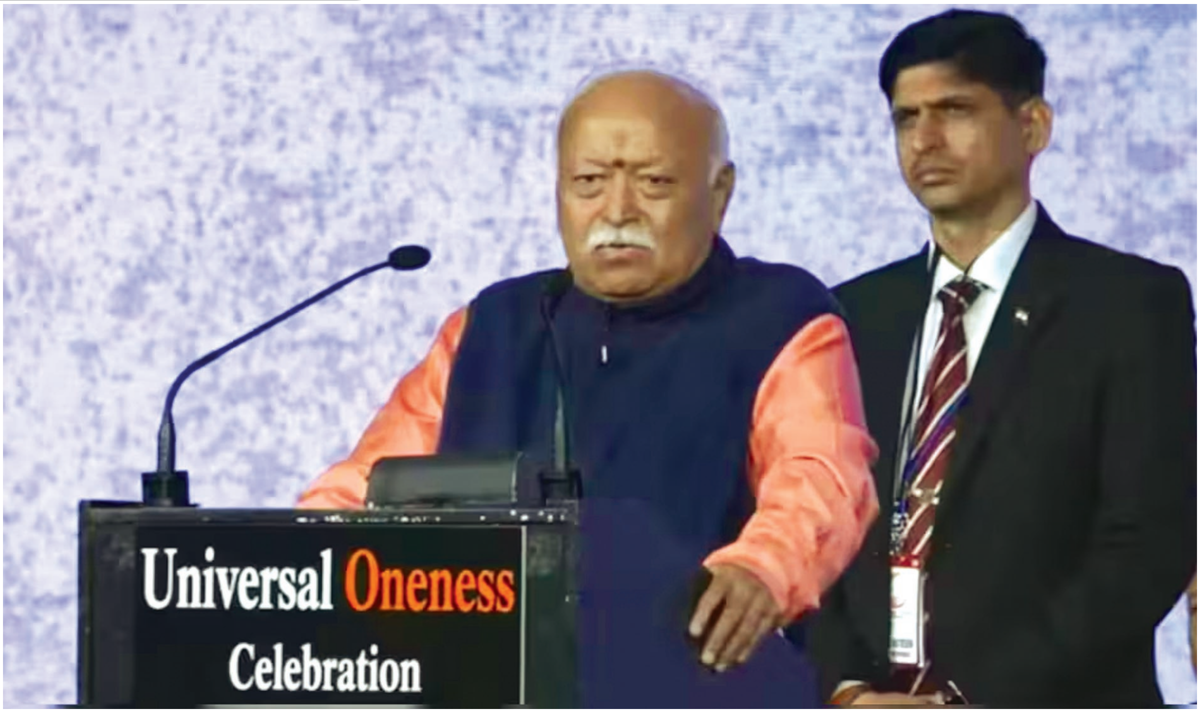

বিশ্বমননে ভারতের অদ্বৈত-ধ্বনি

নিউ ইয়র্কে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত

ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বরাজনীতি ও ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনের এই ক্রান্তিকালে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের বুকে দাঁড়িয়ে এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল বিশ্ববাসী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের সাম্প্রতিক আমেরিকা সফর এবং সেখানে আয়োজিত 'বিশ্বজনীন একত্ব' বা 'ইউনিভার্সাল ওয়াননেস্ সেলিব্রেশন' উৎসবটি কেবল একটি প্রথাগত প্রবাসী সম্মেলন বা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তা হয়ে উঠেছে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বমঞ্চে ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও প্রগতিশীল মেলবন্ধনের এক সুদূরপ্রসারী নিদর্শন। ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহে সমবেত পাঁচ সহস্রাধিক প্রবাসী ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক চিন্তাবিদদের কণ্ঠস্বর এক সূত্রে বেঁধে দিয়ে সরসঙ্ঘচালকজী যে বার্তা দিলেন, তা আদতে বিশ্বমানবতার গভীর সংকটের এক সময়োপযোগী সমাধানসূত্র।

উপস্থাপক সূচনালগ্নেই সরসঙ্ঘচালকজীকে 'বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। এই সম্বোধনটি কোনো অলঙ্কারমাত্র নয়। বর্তমান বিশ্বের নেতৃত্ব যেখানে স্বার্থের সংঘাতে দীর্ণ, সেখানে সরসঙ্ঘচালকজীর আহ্বান ছিল সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ত্যাগের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের। সঙ্ঘের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার অর্থ যে কোনো পার্থিব বা বৈষয়িক প্রাপ্তি নয়, বরং সম্পূর্ণ নিষ্কাম চিত্তে সমাজের থেকে যা কিছু নেওয়া হয়েছে, তা ফিরিয়ে দেওয়ার সাধনা, তা তিনি সঙ্ঘের মূলমন্ত্রের মাধ্যমে পুনরুচ্চারণ করেন— 'আপনি যদি কিছু পাওয়ার আশায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চান, তবে আসবেন না, কিন্তু আপনি যদি নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্বার্থ সেবা করতে চান, তবেই আসুন'। সরসঙ্ঘচালকজীর এই অতি-প্রাচীন অথচ চিরনবীন নীতিটিই আজ বিশ্বজুড়ে মানবতার বন্ধন দৃঢ় করার একমাত্র হাতিয়ার। স্বামী বিবেকানন্দের সেই কালজয়ী উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, প্রতিটি দেশেরই জগতের কাছে একটি বিশেষ দায়িত্ব থাকে। আর ভারতের সেই দায়িত্ব হলো সমগ্র বিশ্বের বৈচিত্র্যের অন্তরালে প্রবাহিত একত্বের অমৃতধারাকে মানুষের মনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

অদ্বৈতবাদের স্নায়বিক সফ্টওয়্যার এবং কুকুরের দৃষ্টির বৈজ্ঞানিক রূপক : সরসঙ্ঘচালকজীর বক্তৃতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দর্শনের অতি গূঢ় তত্ত্বকে বিজ্ঞানের আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলিয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলা। তিনি নিজেকে কোনো ধর্মীয় পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন না করে একজন প্রত্যক্ষ সমাজকর্মী ও পশুচিকিৎসক হিসেবে তুলে ধরেন। মানুষের স্নায়বিক ও ধারণাগত সীমাবদ্ধতা বোঝাতে গিয়ে তিনি তাঁর পশুচিকিৎসক বা ভেটেরিনারি ডাক্তারি জীবনের এক চমৎকার বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক রূপক ব্যবহার করেন। তিনি বলেন যে, প্রতিটি জীবই তার মস্তিষ্কের নিজস্ব সফটওয়্যারের মধ্যে বন্দি। একজন মানুষ প্রকৃতির অন্তত সাতটি রং দেখতে সক্ষম। কিন্তু কুকুর বা অন্যান্য অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী কেবল কালো ও সাদা দেখে অথবা বড়জোর দু'টি বা তিনটি রঙের পার্থক্য বুঝতে পারে।

এখন একজন মানুষ যদি তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে

কুকুরের কাছে সাতরঙা রামধনুর বিবরণ তুলে ধরে, তবে সেই কুকুরের পক্ষে তা অনুধাবন করা অসম্ভব। কুকুরের কাছে তার দ্বিবর্ণের পৃথিবীটাই চরম সত্য, কারণ সেটাই তার ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। মানুষের কাছে তার সপ্তবর্ণের জগৎও সমান সত্য। অর্থাৎ, আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয় ও ধারণার সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে আমরা পরম সত্যের যে আংশিক রূপটি প্রত্যক্ষ করি, তাকেই আমরা সামগ্রিক সত্য বলে ভুল করে বসি। এই ধারণাগত একদেশদর্শিতাই অগতে সমস্ত দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা সবাই আসলে একই অভিন্ন পরম সত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপকে নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভব করছি মাত্র। আর এই পারস্পরিক উপলব্ধির স্বীকৃতিই হলো অদ্বৈত তত্ত্ব ও বিশ্বমানবতার মূল ভিত্তি।

ক্ষুধা ও সংবেদনশীলতার নীতি— ভরা থালার মনস্তত্ত্ব : তাত্ত্বিক দর্শনের সীমানা ছাড়িয়ে মানুষের প্রাত্যহিক নৈতিকতাকে নাড়া দিতে সরসঙ্ঘচালকজী 'ভরা থালার মনস্তত্ত্ব'-এর অভূতপূর্ব নৈতিক পরীক্ষা বা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তিনি বলেন যে, বাহ্যিক বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য জগতিক স্তরে সত্য। আমাদের আলাদাভাবে খেতে হয়, আলাদাভাবে পরিধান করতে হয়, আলাদাভাবে উপার্জন করতে হয়। একজনের ভোজন, অন্য জনের ক্ষুধা মেটাতে পারে না। কিন্তু এই পার্থক্যের গভীরে এক অদৃশ্য সংবেদনশীলতার সুতো আমাদের সবাইকে বেঁধে রেখেছে।

তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, আপনি যখন মধ্যাহ্নভোজন বা নৈশভোজ করতে বসবেন, তখন আপনার সম্মুখে একজন চরম ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিন। সে যদি কাতর চোখে আপনার খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর আপনি যদি তাকে অগ্রাহ্য করে নিজে শান্তিতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করতে চান তবে, আপনি তা পারবেন না। আপনার মনুষ্যত্ব, আপনার ভেতরের সহজাত সংবেদনশীলতা আপনাকে এক কণা হলেও তার মুখে খাদ্য তুলে দিতে বাধ্য করবে। কেন আপনি নিজে সম্পূর্ণ ক্ষুধার্ত না হয়েও অন্যের ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন? কারণ আপনার অন্তরে সেই বিশ্বজনীন একত্বের বীজটি সুপ্ত রয়েছে। পশুদের মধ্যে এই সচেতন চিন্তা থাকে না, তারা প্রকৃতির আদিম প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত। একটি গোরুর পেট ভরে গেলে আর অন্য গোরুর ঘাসের দিকে তাকাবে না, কিন্তু খাওয়ার সময় অন্য কাউকে ভাগ বসাতেও দেবে না। কেবল মানুষই পারে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে এবং সঞ্চয় করতে। এই চিন্তা করার ক্ষমতাই মানুষের পরম গৌরব, আবার অসৎ পথে চালিত হলে তা রাক্ষস বৃত্তির নামান্তর।

দেব ও অসুরের দ্বন্দ্ব— তৃপ্তির অন্বেষণ ও ডোনাটের জাগতিক কৌতুক : সুখ ও স্থায়ী পরমানন্দের চিরন্তন অন্বেষণকে সরসঙ্ঘচালকজী বৈদিক উপনিষদের দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচনের উপাখ্যানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। অতি প্রাচীনকালে মানুষের প্রবৃত্তি অনুযায়ী দুটি

'নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও' নীতিতে আটকে থাকলে চলবে না, আমাদের লক্ষ্য হতে হবে 'অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করো'। রক্ষাবন্ধনের এই পবিত্র তিথিতে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার থেকে বিশ্বজুড়ে একত্বের যে মহান সুর ধ্বনিত হলো, তা আগামীদিনের এক শান্তিময়, সুসংহত ও বৈষম্যহীন নতুন বিশ্ব গঠনের চালিকাশক্তি হয়ে থাকবে

স্পষ্ট দলে মানবসমাজ বিভক্ত ছিল। দেবতাদের স্বভাব ছিল 'নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও' আর অসুরদের স্বভাব ছিল নিজে বাঁচো এবং কেবল তাদেরই বাঁচতে দাও যারা আমাদের পদানত থাকবে। উভয় সমাজের কাছেই প্রাচুর্যের কোনো অভাব ছিল না. কিন্তু তাদের জীবনে শান্তি বা মানসিক তৃপ্তির অন্তর ছিল।

এই প্রসঙ্গে সরসঙ্ঘচালকজী নিউ ইয়র্কের ডোনাটের এক চমৎকার মজার রূপক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কোনো মানুষ যদি ডোনাট খেতে খুব ভালোবাসে, সে বড়জোর একসঙ্গে পঞ্চাশটি খেতে পারবে। পঞ্চাশতম ডোনাটটি মুখে দেওয়ার পর সে হয়তো তীব্র অনিচ্ছায় বলবে এটিকে আমার চোখের সামনে থেকে দূর করো। অথচ ডোনাটের স্বাদ বা উপাদানে কোনো পরিবর্তন হয়নি, পরিবর্তন হয়েছে মানুষের অন্তরের তৃপ্তিতে। অর্থাৎ, জাগতিক ও বস্তুগত সুখ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তা মানুষকে চিরস্থায়ী শান্তি দিতে পারে না।

এই সত্য উপলব্ধি করে ইন্দ্র ও বিরোচন পরম তৃপ্তির খোঁজে নিজ নিজ গুরুর উপদেশে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মদেব তাঁদের প্রথমে চাক্ষুষ পরীক্ষার মাধ্যমে একে অপরের চোখের তারায় ফুটে ওঠা প্রতিচ্ছবি দেখতে বললেন। বিরোচন এই প্রতিচ্ছবিকে দেহেরই রূপান্তর মনে করে দেহকেই আত্মা বা পরম সত্য বলে ধরে নিলেন এবং বস্তুবাদী অহঙ্কারে মেতে উঠলেন। কিন্তু ইন্দ্র লক্ষ্য করলেন যে জলের কম্পনে সেই প্রতিচ্ছবি ভেঙে যায় এবং দেহ বার্ধক্যে নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং প্রতিচ্ছবি বা দেহ কখনোই অমর আত্মা হতে পারে না। তিনি পুনরায় ব্রহ্মার কাছে ফিরে গিয়ে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে সেই অখণ্ড ও অক্ষয় পরমাত্মার স্বরূপ অনুধাবন করলেন। এই উপাখ্যান বর্ণনার মাধ্যমে সরসঙ্ঘচালকজী বুঝিয়েছেন যে, মালাতে থাকা মুক্তোগুলোকে যেমন একটি অদৃশ্য সুতো গেঁথে রাখে, আমাদের সমস্ত বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার গভীরেও তেমনই এক অখণ্ড আত্মা বিরাজ করছে।

ধর্ম—'রিলিজিয়ন'-এর ঊর্ধ্বে ধারণকারী শক্তি : সরসঙ্ঘচালকজী তাঁর ভাষণে ধর্ম ও রিলিজিয়ন-এর মধ্যকার ধারণাগত পার্থক্যকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, আন্তর্জাতিক মহলে যার প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। তিনি বলেন যে, 'ধর্ম' কোনো প্রথাগত উপাসনা পদ্ধতি বা রিলিজিয়ন নয়। 'ধর্ম' হলো সেই ধারণকারী শক্তি বা বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়ম যা সমগ্র সৃষ্টিকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খল রাখে। 'ধর্ম' এমন এক ভারসাম্য যা ব্যক্তি, সমাজ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত করে।

ভারতের সনাতন সংস্কৃতিতে আমরা ভারতীয়রা নদী, গাছপালা, পাথর ও পাহাড়-পর্বতকে পূজা করি। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো প্রকৃতির প্রতি আমাদের পরম দায়িত্বশীলতাকে সদা জাগ্রত রাখা। আজকাল পাশ্চাত্যে ফাদার্স ডে বা মাদার্স ডে পালন করার যে রেওয়াজ রয়েছে, তার উদ্দেশ্যও একপ্রকার পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও কর্তব্যবোধকে স্মরণ করা।

কিন্তু ভারতীয় দর্শন আমাদের শেখায় প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বশীল থাকা। এমনকী যখন আমরা কোনো অমঙ্গলকারী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি কিন্তু শত্রুর শারীরিক বিনাশ প্রার্থনা করে না। আমরা প্রার্থনা করি 'শত্রু বুদ্ধি বিনাশায়' অর্থাৎ শত্রুর ভেতরের ক্ষতিকর ও অসৎ বুদ্ধির বিনাশ হোক। শত্রুতামূলক মনোভাব চিরস্থায়ী নয়, পরিস্থিতির বশে তার জন্ম হয়। মানুষের ভেতরের অসৎ প্রবৃত্তিকে শোধন করাই ধর্মের আসল উদ্দেশ্য।

রাজনীতি, সেবা ও মানবতার রসায়ন— চড়খি দাদরির অলিখিত ইতিহাস : সরসঙ্ঘচালকজী তাঁর ভাষণে সমাজ পরিবর্তনের মূল ভিত্তি হিসেবে রাজনীতির সীমানাকে অতিক্রম করে নিঃস্বার্থ সেবাকাজ ও সামাজিক সংলাপের (অর্থাৎ আলাপ- আলোচনার) ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত রূঢ় বাস্তব সত্য তুলে ধরে বলেন যে, রাজনীতি আজ ব্যক্তিস্বার্থ ও কায়েমি স্বার্থের খেলায় পরিণত হয়েছে। যেখানে 'আমি ও আমার'— এই সংকীর্ণ অহংকার থাকবে, সেখানে কোনো সমস্যার স্থায়ী সমাধান আসতে পারে না। প্রকৃত শান্তি ও উন্নয়ন কেবল 'আমরা ও আমাদের' এই সমন্বিত ভাবনার মধ্য দিয়েই সম্ভব। আর এই কারণেই সঙ্ঘ সরাসরি রাজনীতির ওপর নির্ভর না করে সমাজের তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করে চলেছে।

সঙ্ঘের এই নিঃস্বার্থ সেবামূলক মনোভাবের জলজ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে তিনি হরিয়ানার চড়খি দাদরি বিমান দুর্ঘটনার এক ঐতিহাসিক ও গৌরবময় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি দু'টি আরব দেশের বিমানের মধ্যে সংঘর্ষে শতাধিক মুসলমান যাত্রী নিহত হয়েছিলেন। সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্ঘের স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা উদ্ধারকাজে প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দুর্ঘটনায় আহতদের তাঁরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁরা সমস্ত মৃতদেহ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্বক উদ্ধার করেন, ইসলামি রীতিনীতি মেনে তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন এবং দেহ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে তাদের আত্মীয়দের সাহায্য করার জন্য রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সরসঙ্ঘচালকজী বলেন, আমরা সে সময় একবারের জন্যও ভাবিনি যে তাঁরা অন্য উপাসনা পদ্ধতির বা অন্য দেশের। আমরা কেবল সেবাকাজ করে গিয়েছিলাম, কারণ আমাদের কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বা প্রচারের মোহ ছিল না। সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বাইরে যে কৃত্রিম নেতিবাচক ন্যারেটিভ বা অপপ্রচার ছড়ানো হয়েছে, এই ধরনের বাস্তব কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলে সেই সমস্ত ভ্রান্তির কুয়াশা নিমেষেই কেটে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বেদনা ও আর.ডি. রণডের মরমি সাধনা : অদ্বৈত তত্ত্ব বা পরম একত্বের এই দর্শন যে কেবল পুঁথিগত শুষ্ক তত্ত্ব নয়, বরং তা মানুষের স্নায়ু ও স্পন্দনে অনুভব করা সম্ভব, তা প্রমাণ করতে সরসঙ্ঘচালকজী ভারতের ইতিহাসের দুই মহান আধ্যাত্মিক সাধকের বাস্তব জীবনের চাক্ষুস উদাহরণ তুলে ধরেন। প্রথমজন হলেন স্বামী বিবেকানন্দের পরমারাধ্য গুরুদেব যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সরসঙ্ঘচালকজী অত্যন্ত চমৎকারভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এক কালজয়ী চাক্ষুস বেদনার ঘটনা উল্লেখ করেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গঙ্গাতীরে আপন মনে বসে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন কিছু দূরে চারণভূমিতে এক অবলা গোরুর পিঠে এক ব্যক্তি সজোরে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাতীরে বসে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলেন এবং ছটফট করতে লাগলেন। উপস্থিত ভক্তরা যখন তাঁর বুকের বস্ত্র সরালেন, তখন তারা অবাক হয়ে দেখলেন যে গোরুর পিঠে লাঠির আঘাতে যে তীব্র লাল ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয়েছিল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বুকেও হুবহু সেই রক্তবর্ণ ক্ষতচিহ্ন ভেসে উঠেছে। এটি কোনো কাল্পনিক পৌরাণিক আখ্যান নয়— এটি আধুনিক ইতিহাসের এক নথিবদ্ধ অখণ্ড সত্য। এটিই হলো চরম অদ্বৈত সাধনা, যেখানে অন্যের বেদনা নিজের স্নায়ুতে সঞ্চারিত হয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে সরসঙ্ঘচালকজী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের স্বনামধন্য ডিন এবং মহাসাধক গুরুদেব আর.ডি. রণডে বা রামচন্দ্র দত্তাত্রেয় রণডের কথা উল্লেখ করেন। প্রফেসর রণডে ছিলেন একাধারে পরম বিদ্বান এবং মরমী সিদ্ধপুরুষ। তিনি গ্রিক দর্শন, ইসলামিক সুফিবাদ, ক্যাথলিক রহস্যবাদ-সহ পৃথিবীর সমস্ত মরমি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যায়ন করেছিলেন এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর সারা জীবনের গবেষণার শেষে এক পরম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে— পথ, ভাষা ও দেশের ভিন্নতা যতই থাকুক না কেন, বিশ্বের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সাধকদের চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও পরম আনন্দ আশ্চর্যজনকভাবে একই রকম।

'অন্তিম তিন ফুট'-এর দর্শন এবং ভবিষ্যৎ সংকল্পের পথরেখা : যেকোনো বড়ো সামাজিক বা বিশ্বজনীন রূপান্তরের কাজে সময় লাগে। মানুষের শতাব্দী-প্রাচীন কুপ্রথা, সংকীর্ণতা, অন্ধবিশ্বাস ও কু-অভ্যাস রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। এই দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ে অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে মাঝপথে হতাশ হয়ে পড়েন। এই হতাশার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সরসঙ্ঘচালকজী আমেরিকার বিখ্যাত 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকা থেকে এক চরম হতাশ মানুষের জীবনের গল্প শোনান। সেই ব্যক্তিটি তাঁর জীবনে চাকরি, পরিবার, ঘরবাড়ি এবং সমস্ত অর্থ হারিয়ে যখন আত্মহত্যার চরম সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলেন, তখন পকেটে থাকা শেষ দেড়শো ডলার দিয়ে, তিনি এক নিলামে ওঠা দেউলিয়া হয়ে যাওয়া এক খনি কোম্পানির এক টুকরো পরিত্যক্ত জমি কিনে নেন। পূর্বতন খনি কোম্পানিটি ১৫০ ফুট খনন করেও কোনো খনিজ না পেয়ে হতাশ হয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু নতুন মালিকের নির্দেশে খনির শ্রমিকরা যখন আর মাত্র '৩ ফুট' মাটি খনন করল, অমনি সেখানে এক সুবিশাল খনিজ ভাণ্ডারের সন্ধান মিলল। সেই ব্যক্তি রাতারাতি তাঁর সমস্ত সমৃদ্ধি ফিরে পেলেন।

তাই, সাফল্যের ঠিক দোরগোড়ায় এসে হতাশার বশে হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না। সঙ্ঘ যখন বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছে, অনেকে এসে অধৈর্য হয়ে বলেন যে সাতটি বৈঠক হয়ে গেল কিন্তু কোনো পরিবর্তন তো হলো না। সরসঙ্ঘচালকজীর উত্তর— ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন, সংকল্পে অবিচল থাকুন, উদ্দেশ্য সৎ হলে সাফল্য নিশ্চিত আসবে।

শেষে, তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বিশ্বজুড়ে 'পঞ্চ পরিবর্তন' বা পাঁচটি বড়ো সামাজিক ও পরিবেশগত রূপান্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ডাক দেন। মানুষের দায়িত্ব প্রকৃতির মালিক হওয়া নয়, বরং প্রকৃতির রক্ষক হওয়া। আমাদের কেবল 'নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও' নীতিতে আটকে থাকলে চলবে না, আমাদের লক্ষ্য হতে হবে 'অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করো'। রক্ষাবন্ধনের এই পবিত্র তিথিতে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার থেকে বিশ্বজুড়ে একত্বের যে মহান সুর ধ্বনিত হলো, তা আগামীদিনের এক শান্তিময়, সুসংহত ও বৈষম্যহীন নতুন বিশ্ব গঠনের চালিকাশক্তি হয়ে থাকবে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। □

ঊষর পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বকর্মার আগমন আসন্ন

পশ্চিমবঙ্গের নতুন শিল্পনীতি : ২০২৭-এর মধ্যে রাজ্যের উৎপাদন ব্যবস্থায় গতিসঞ্চার ও উৎপাদন শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে নবনির্বাচিত সরকার নতুন শিল্পনীতির রূপরেখা উন্মোচন করেছে, যার মূল বিষয়গুলো হলো— একটি এক-জানালা ব্যবস্থার (সিঙ্গল্ উইন্ডো সিস্টেমের) ছাড়পত্র, লাইন-ভিত্তিক অনুমোদন, ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস)-আধারিত ল্যান্ডব্যাংক এবং একটি বিনিয়োগকারী সহায়ক উৎসাহ প্রদানকারী প্রশাসনিক কাঠামো।

ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য

শিল্প, শ্রম তথা শ্রমিকের দেবতা দেবশিল্পী শ্রীশ্রীবিশ্বকর্মা। ছোটোবেলায় দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শিল্পী, শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কী আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা সৃষ্টি হতো এই বিশ্বকর্মা পূজাকে কেন্দ্র করে। দুর্গাপূজার মাসখানেক আগেই ভাদ্র সংক্রান্তিতে চারিদিকে চলে আসত ঝলমলে উৎসবের পরিবেশ, সংশ্লিষ্ট সকলের মনে কী আনন্দ! তারপর কী যে হলো! গত পঞ্চাশ বছর ধরে শিল্প-নিধন দানবের খপ্পরে পড়ে ধীরে ধীরে গ্রাস হতে থাকল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্প; নিভতে থাকল বয়লার এবং ব্লাস্ট ফার্নেসের চুল্লি, হারিয়ে গেল গগনচুম্বী চিমনির রঙ-বেরঙের ধোঁয়া, স্তব্ধ হলো সময় জানানো ভোঁ (সাইরেন)-এর আওয়াজ! বন্ধ কলকারখানার সংশ্লিষ্ট কর্মীরা হলেন কর্মহারা, হারিয়ে গেল তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য, ভেঙে পড়ল বিভিন্ন জেলার স্থানীয় তথা রাজ্যের অর্থনীতি! দক্ষ শ্রমিক চোখের জল মুছতে মুছতে পরিবার-পরিজনদের ছেড়ে জীবিকার তাগিদে পাড়ি দিলেন ভিন রাজ্যে, হয়ে গেলেন পরিযায়ী শ্রমিক!

গত প্রায় পঞ্চাশ বছরে এরাজ্যে শিল্প খরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (১৯৭৭ - ২০২৬) :

বামফ্রন্টের শাসনকাল (১৯৭৭-২০১১) : দীর্ঘ ৩৪ বছর বামফ্রন্ট অপশাসনে শ্রম-অস্থিরতা, শ্রমিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ এবং লক-আউটের কারণে হাওড়া ও হুগলী অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এবং পাট কলগুলির ক্রমাগত পতন ঘটেছিল। এছাড়াও পতন ঘটে দুর্গাপুর-রানিগঞ্জ- আসানসোল শিল্পাঞ্চল-সহ বিভিন্ন জেলায় বহু ভারী শিল্প, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার। এই সময়ে বহু শিল্পগোষ্ঠী এরাজ্য থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ক্রমশ চলে যায় অন্যান্য রাজ্যে, বলা ভালো তারা একপ্রকার চলে যেতে বাধ্য হয়। বন্ধ হওয়া শিল্পের সেই তালিকা এত দীর্ঘ যে তার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন এই নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে অত্যন্ত কঠিন।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনকাল (২০১১-২০২৬) : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সরকারি তথ্য জানাচ্ছে যে, ২০১১-২০২৫ এই সময়ের মধ্যে এরাজ্য থেকে যে ৬,৬৮৮টি নিবন্ধিত সংস্থা অন্য রাজ্যে চলে গেছে তার মধ্যে ১১০টিই ছিল 'পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি' যা এই রাজ্য থেকে শিল্প-বিতাড়নের করুণ ছবি তুলে ধরে।

১৯৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম শক্তিশালী শিল্পকেন্দ্র ছিল। ১৯৭৭ সালে ৩৪ বছরের বাম শাসনের সূচনা হয়। ১৯৭৭-এর পরের সময়কালে জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন, ঘন ঘন ধর্মঘট, লক-আউট ও রাজ্য সরকার প্রণীত বিভিন্ন শিল্পবিরোধী নীতি বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতিকূল হিসাবে প্রকট হয়ে ওঠে। শিল্পবিরোধী পরিবেশের কারণে কারখানার মালিকরা শিল্প পরিচালনার বিষয়ে ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলেন, ফলে শিল্পগুলি অচল হয়ে পড়ে এবং মূলধন ধীরে ধীরে রাজ্যের বাইরে চলে যায়।

দেশের শিল্প-শ্রমিকদের মাত্র ৭ শতাংশ থাকা সত্ত্বেও ভারতে লক-আউট সম্পর্কিত কর্মদিবস নষ্টের ৪০ শতাংশেরও বেশি ছিল এই রাজ্যের। ১৯৯১ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে, এই রাজ্য ভারতের মোট বেসরকারি বিনিয়োগের প্রস্তাবগুলির ৪ শতাংশেরও কম টানতে পেরেছিল। ১৯৭৭ সালে গোটা দেশে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নিরিখে দ্বিতীয় স্থান থেকে ২০০৭ সালে সপ্তম স্থানে নেমে আসে পশ্চিমবঙ্গ। শিল্পের পতনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন দুর্বল হয়ে পড়ে, কৃষিক্ষেত্রজাত আর্থিক বৃদ্ধি কমে যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের মাথাপিছু আয় জাতীয় গড়ের নীচে নেমে যায়। পশ্চিমবঙ্গ একসময় ভারতের জিডিপিতে ১০ শতাংশেরও বেশি অবদান রেখেছিল কিন্তু ৩৪ বছরের বাম অপশাসন পশ্চিমবঙ্গকে অর্থনৈতিক পতনের দিকে ঠেলে দেয়। শিল্প বিকাশের পরিবর্তে, বামপন্থীরা ধর্মঘট, ভয়, সন্ত্রাস ও বন্ধের সংস্কৃতি তৈরি করেছিল। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট ১৭৯টি থেকে বেড়ে ৬৭৮টি হয়ে যায়। ১৯৯১ সালের মধ্যে, ভারতে লক-আউট সম্পর্কিত শ্রমদিবস নষ্টের ৪০ শতাংশেরও বেশি ভাগীদার ছিল এই রাজ্য!

২০১১-র পর এরাজ্যের মানুষ তৃণমূল

ফঃ ২

সরকারের অধীনে পরিস্থিতির পরিবর্তনের আশা করেছিলেন, কিন্তু তৃণমূলি অপশাসনে এরাজ্যের অর্থনৈতিক পতন আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়।

একদিকে যখন সিঙ্গুর পর্বে টাটাদের বিতাড়নের ঘটনা এরাজ্যে শিল্প স্থাপনের বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ভেঙে দেয়, তখন অপরদিকে তৃণমূল শাসনের অধীনে দুর্নীতি, কাটমানি রাজনীতি ও সিন্ডিকেটরাজ ফুলেফেঁপে ওঠে। 'মা- মাটি-মানুষ' এরাজ্যে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয়। সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের পাঁচ দশকের অপশাসন ও অব্যবস্থাপনার জন্য এরাজ্যের দু'টি প্রজন্মকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

খেদের বিষয় এই যে, ১৯৭৭ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের মোট বন্ধ বা স্থানান্তরিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো সঠিক ও সুসংহত অফিসিয়াল তথ্য জনগণের জ্ঞাতার্থে পাবলিক মেট্রিক হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। জানা গেছে যে, এই সময়কালে ১৮,৪৫০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে এবং এরাজ্যে ৩০ লক্ষ কর্মসংস্থান ধ্বংস হয়েছে। ফলস্বরূপ, গত ৪৯ বছরের অপশাসন পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগকে ধ্বংস করে দেয় এবং বঙ্গীয় যুবসমাজকে এর মূল্য দিতে হয়।

সংস্থাগুলি স্থানান্তর করার জন্য শীর্ষ গন্তব্য রাজ্যগুলি (২০১১-২০২৫) : মহারাষ্ট্র : ১,৩০৮টি সংস্থা। **দিল্লি :** ১, ২৯৭টি কোম্পানি। **উত্তরপ্রদেশ :** ৮৭৯টি কোম্পানি। **ছত্তিশগড় :** ৫১১টি কোম্পানি। **গুজরাট :** ৪২৩টি কোম্পানি। **অন্যান্য রাজ্য (সম্মিলিত) :** ২,২৭০টি কোম্পানি (রাজস্থান, অসম, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানা-সহ)।

গত ৪ মে রাজনৈতিক পালাবদলের ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার। রাজ্যের এই জাতীয়তাবাদী সরকারের কাছে এরাজ্যের জনগণের বিপুল প্রত্যাশা। তাঁরা শিল্পক্ষেত্রের শ্মশানে নতুন প্রাণের সঞ্চার আশা করছেন। তাঁরা চান পশ্চিমবঙ্গ আবার শিল্পের জোয়ারে নতুন নতুন সৃষ্টিতে মেতে উঠুক, প্রত্যেক সবল ও দক্ষ হাতে যন্ত্র আবার সচল হোক, মেধাবী যুবশক্তির সৃজনশীলতা আবার এরাজ্যকে শিল্পের আঙিনায় বিকশিত করে তুলুক।

সুখের কথা এই যে, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই শিল্পক্ষেত্রে যাবতীয় সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। শিল্পের বিনিয়োগে জোর দিয়েছে রাজ্য। সেই লক্ষ্যেই উদ্যোগপতিদের সঙ্গে গত তিন মাস ধরে দফায় দফায় আলোচনা চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পে ভরিয়ে দেবেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজগৃহে ফিরিয়ে এনে তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে বিভিন্ন জেলায় শিল্পায়নকে সেই লক্ষ্যপূরণের অন্যতম হাতিয়ার করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন শিল্পনীতি : ২০২৭-এর মধ্যে রাজ্যের উৎপাদন ব্যবস্থায় গতিসঞ্চার ও উৎপাদন শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে নবনির্বাচিত সরকার নতুন শিল্পনীতির রূপরেখা উন্মোচন করেছে, যার মূল বিষয়গুলো হলো— একটি এক-জানালা ব্যবস্থার (সিঙ্গল্ উইন্ডো সিস্টেমের) ছাড়পত্র, লাইন-ভিত্তিক অনুমোদন, ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস)-আধারিত ল্যান্ডব্যাংক এবং একটি বিনিয়োগকারী সহায়ক উৎসাহ প্রদানকারী প্রশাসনিক কাঠামো।

নবনির্বাচিত সরকার প্রণীত শিল্পনীতিটি— পূর্বতন সরকারের শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ না করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে একটি স্বচ্ছ, বিনিয়োগ-বান্ধব প্রশাসনের দিশা দেখাচ্ছে।

গত এক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৫টি কোম্পানির কাছে শিল্প স্থাপনের জন্য জমি হস্তান্তর করার পরিকল্পনা করেছে। এরাজ্য এখন শিল্পের জন্য জমি বরাদ্দ করার প্রশাসনিক নীতি পর্যালোচনা করছে, একটি নতুন শিল্প নীতি নিয়ে কাজ করছে এবং ভারত জুড়ে ১০০টি 'প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রের ৩৩,৬৬০ কোটি টাকার প্রকল্প—'ভারত ঔদ্যোগিক বিকাশ যোজনা'র অধীনে প্রস্তাব প্রস্তুত করছে।

রাজ্যের প্রস্তাবিত সরাসরি জমি ক্রয় নীতি এবং বড়ো বিনিয়োগের জন্য এক-জানালা ছাড়পত্রের পাশাপাশি এক মাসের মধ্যে ২৫টি শিল্পকে জমি বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা থেকে বোঝা যায় যে বিভিন্ন শিল্প-প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি অবশেষে এরাজ্যের শিল্পনীতির অংশ হয়ে উঠছে। এই বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিল্প বিনিয়োগ উপযোগী বাস্তুতন্ত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশের মাধ্যমেই পল্লবিত হয়। পশ্চিমবঙ্গকে প্রমাণ করতে হবে যে, এখন এখানে একজন বিনিয়োগকারী নির্ভয়ে আসতে পারবেন, শিল্প স্থাপন করতে পারবেন, শিল্পে লগ্নি করে প্রভূত লাভের মুখ দেখতে পাবেন এবং এই প্রক্রিয়ায় বছরের পর বছর সময় নষ্ট না করে শিল্পোৎপাদন শুরু করতে পারেন। শিল্পের জন্য খাতায়-কলমে ল্যান্ডব্যাংক থাকা এবং বাস্তবে শিল্প অর্থনীতি গড়ে তোলার মধ্যে এটাই পার্থক্য। এরাজ্যের জনগণের বুকভরা আশা— আগামী কয়েক বছরেই শিল্পোদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ আবার আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, বেকারত্ব ঘুচবে, ঘরের ছেলে-মেয়েরা ঘরে ফিরে আসবে। তাই আজ যেন আকাশে বাতাসে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে, ঊষর পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বকর্মার আগমন আসন্ন!

□

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

শরৎচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী মানসিকতা তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রভাবিত করেছিল

ডঃ বাপ্পাদিত্য মাইতি

তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী। অসহায়, উৎপীড়িত বা সমাজ পরিত্যক্তাদের প্রতি সংবেদনশীল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানে অবহেলিত মানুষদের সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সেতুহীন দূরত্ব। যাঁর বুকে দেশ ও দেশবাসীদের প্রতি এমন নিঃশর্ত, নিঃস্বার্থ সমুদ্রঘন ভালবাসা রয়েছে তিনি তো সমসময়ের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন না হয়ে যান না। তাঁর বোহেমিয়ান স্বভাব, নানা জায়গা ও দেশ দেখার অভিজ্ঞতা, বিশেষত বাস্তব সচেতনতা— তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিল। শরৎ সাহিত্যে নানাভাবে এসেছে পরাধীন ভারতের কথা, পরাধীনতার লাঞ্ছনার রক্তাক্ত লজ্জাজনক অধ্যায়, আর প্রতিরোধের অয়স্কান্ত ব্রত। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের লেখায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির নানা কথা এসেছে। আর এর ভিত্তিভূমি সৃষ্টির মূলে রয়েছে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সক্রিয় রাজনীতির সংস্পর্শ।

পরাধীন ভারত। নানা আন্দোলন। নানা প্রতিবাদ। প্রতিরোধ। ১৯২০-তে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। তখন বঙ্গদেশের অবিসংবাদী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধুর প্রতি ছিল শরৎচন্দ্রের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আস্থা। সেই দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শরৎচন্দ্র হলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। নির্বাচিত হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য।

দেশের কাজে তাঁকে প্রতিদিন আসতে হতো কলকাতায়। শিবপুর থেকে প্রায়ই যেতেন দেশবন্ধুর বাড়িতে। কখনো ওয়েলিংটনে কংগ্রেস নেতা নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে। রাজনীতিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় সুভাষচন্দ্র, নির্মলচন্দ্র, হেমন্ত কুমার সরকারের। সর্বাধিক সংযোগ অবশ্যই দেশবন্ধুর সঙ্গে। শখের রাজনীতিক ছিলেন না শরৎচন্দ্র। জাতীয় রাজনীতির দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ঝানু রাজনীতিকরা যখন পথ হারানো অন্ধকারে সিদ্ধান্তের আলো খুঁজতে গলদঘর্ম হতেন, তখন শরৎচন্দ্র কাপের পর কাপ চা আর বর্মা চুরুট যোগে মোক্ষম রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতেন। 'পথের দাবী'র লেখক ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতি বা গান্ধীজীর চরকায় একটুও আস্থাশীল ছিলেন না। গান্ধীজী যখন শরৎবাবুকে জিজ্ঞেস করেন তিনি চরকায় আস্থাশীল কিনা, তখন শরৎচন্দ্র ঈষৎ হাস্যযোগে তাঁর সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করেন—'I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders.'

১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে কেউই সাহসী হননি। ব্যতিক্রম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তিনি ব্রিটিশ রাজের চণ্ডনীতিকে একটি চিঠিতে তীব্র আক্রমণ করে নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন। এ ঘটনায় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত খুশি হয়ে ১৬ আগস্ট ১৯১৯-এ অমল হোমকে এক পত্রে জানান— 'আর এক লাভ দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনি আমাদের মুখ রেখেছেন।'

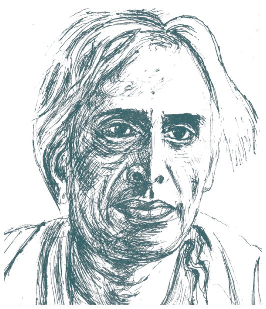

ভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এভাবেই স্বাধীনতার সঠিক পথের দাবি শরৎচন্দ্র উপস্থাপন করেছিলেন অনন্য দূরদৃষ্টি ও আপোশহীন সংগ্রামী মনোভাবের সাহায্যে।

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে শরৎচন্দ্র বিলেতি পণ্য বিসর্জনে সক্রিয় হলেন। সঙ্গী হলেন জেলার একাধিক কংগ্রেস নেতা প্রবোধ চন্দ্র বসু, গুরুদাস দত্ত, নারায়ণ চন্দ্র বসু, অমৃতলাল হাজরা প্রমুখ। ১৯২১-এ দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ বর্জন করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। শরৎচন্দ্র গুরুদেবের এই মনোভাবে অবশ্য ব্যথিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক উত্তেজনার স্রোতে তিনি নিজেকে এসময় একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। দাবা খেলা ও মৎস্য শিকার তখন তাঁর শিকেয় উঠেছে। সাহিত্য আড্ডা তখন বন্ধ। প্রিয় পোষ্য ভেলু বা আদরের পাখি তখন তাঁর সান্নিধ্য পায় না। তিনি যে দেশ স্বাধীনের উত্তেজনায় বিভোর।

শরৎচন্দ্র মুক্ত মনের মানুষ। এ দেশের মেয়েদের প্রতি যাঁর সমবেদনা সর্বাধিক, তাঁর পক্ষে স্বদেশীয় বীরাঙ্গনাদের প্রতি শীতল মনোভাব প্রদর্শন তো সম্ভব নয়। তাঁরই সক্রিয় সমর্থনে সেদিন উর্মিলা দেবী, নেলী সেন ও হেমপ্রভা মজুমদারের মতো আলোকপ্রাপ্তারা স্বদেশ মুক্তিযজ্ঞে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁদের এত উদ্দীপ্ত করেছিলেন যে মুষ্টিমেয় প্রমীলা বাহিনী পিকেটিং করে সমগ্র দেশব্যাপী প্রবল স্বাদেশিকতার স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র স্বার্থ-বর্জিত রাজনীতিক। বিশ্বাস করতেন প্রবল আন্দোলনে। খাদি পরতেন কেবল কংগ্রেসের নিয়ম নীতিকে সম্মান জানাতে। এ সময় উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরাতে উত্তেজিত জনতার হাতে থানার সিপাইদের মৃত্যু হলে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করলে শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হন। তাঁর রক্ত ঝরানো মন্তব্য— ‘‘এত বড় বিরাট

দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই তো! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে— সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই তো ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। কীসের অনুতাপ এতে? 'Non violence খুব noble idea কিন্তু Achievement of freedom is nobler— hundred times nobler.'

নানা কারণে বিক্ষুব্ধ ও মর্মাহত শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ১৯২২-এ। যদিও দেশবন্ধুর আহবানে তাঁকে স্বপদে ফিরতে হয়। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল প্রত্যাশাহীন, মর্যাদাদীপ্ত। ফলে অনায়াসেই তিনি সম্মান ও ক্ষমতার রাজপথ মাড়িয়ে যেতে দ্বিধা করেননি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসেছে বরিশালে ১৯২৩-এ। সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। সভাপতির একটি মতামত সম্পর্কে দেশবন্ধুর মতো মানুষ কিছু বলতে গেলে শ্যামসুন্দর অসুন্দর দম্ভোক্তি করে বলেন—''I won't hear that man", শরৎচন্দ্র স্বভাবতই প্রতিবাদী হন। শ্যামসুন্দর তখন যেন 'হাই কমান্ড'-এর রুদ্র রূপ। চক্রবর্তী মশাই শরৎচন্দ্রের মুখের ওপর সটান বলে বসলেন—''I can't stand your face."। অপমানিত শরৎচন্দ্র রাজনীতি ছাড়তে চাইলেন। দেশবরেণ্য সাহিত্যিকের প্রতি এমন নির্লজ্জ ব্যবহার দেখে দেশবন্ধুই শরৎচন্দ্রকে সরে যেতে অনুরোধ করলেন। তাঁর মতো রুচিশীল সাহিত্যিকের এক মুহূর্তও আর রাজনীতি করা উচিত নয় বলে চিত্তরঞ্জন জানালেন। সংসারের নানা ঘাটে যাঁকে জীবনতরী বইতে হয়েছে তিনি অত সহজে শত্রুদের ছাড়বেন কেন? ঘরে-বাইরে নানা ভাবে অপদস্থ দেশবন্ধুর পাশেই দাঁড়াতে চেয়ে তিনি বললেন— 'আপনার এ অসহায় অবস্থা, চারিদিকে এই বাধবিদ্রূপের বেড়াজালের মধ্যে আপনাকে বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করি কী করে? না আপনাকে ফেলে পালাতে পারব না।'

১৯২৩-এর সেপ্টেম্বরে দিল্লি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রও যান। সেই অধিবেশনে কংগ্রেস কর্মীদের আইনসভায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। দেশবন্ধু অনুরোধ করলেন হাওড়া থেকে শরৎচন্দ্রকে দাঁড়াতে। কিন্তু কোনো পদপ্রাপ্তি প্রার্থিত ছিল না শরৎচন্দ্রের। ফলে সবিনয়ে প্রত্যাখান করলেন দেশবন্ধুর প্রস্তাব। দেশবন্ধু যখন 'স্বরাজ্য দল' গঠন করলেন, তখন তাঁর প্রধান দুই সহযোগী হলেন সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। কী অসাধারণ সব নেতৃত্ব! নির্লোভ, নিবেদিতপ্রাণ। আজকের প্রেক্ষিতে কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক বিবৃতি তৈরি করে নিতেন শরৎচন্দ্র। ফরোয়ার্ড পত্রিকার শেয়ার বিক্রি করতেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। বস্তুত দেশবন্ধুর দেশপ্রীতির উদ্যানে উৎসাহের বারিসিঞ্চনের কাজ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। ফলে ১৯২৫-এ দার্জিলিঙে দেশবন্ধুর প্রয়াণ হলে শরৎচন্দ্র একেবারে ভেঙে পড়েন।

দেশবন্ধুর বাড়ি ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তীর্থক্ষেত্র। নরমপন্থী- চরমপন্থী সব শ্রেণীর মানুষ আসতেন। দেশবন্ধুর বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল বলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগসূত্র তৈরি হয়। বিপ্লবীদের অনিবার্য স্বার্থ ত্যাগ, মৃত্যুকে অনায়াসে বরণ করার আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করেছিল। নিজে কংগ্রেস নেতা হলেও হাওড়ার বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ছিল অন্তরের সম্পর্ক। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর মাতুল।

শরৎচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী মানসিকতা তাঁর সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছিল। বিশেষত ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত এ মনোভাব খুব স্পষ্ট। তিনি কংগ্রেস কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে এসেছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবী মনোভাবে প্রথম থেকেই ছিলেন আস্থাশীল। তাঁর রচিত 'পথের দাবী' উপন্যাসটি ছিল বিপ্লবীদের মহাগ্রন্থ। এই উপন্যাসের নায়ক ডাঃ সব্যসাচী মল্লিকের চরিত্রটি নির্মিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের স্বচক্ষে দেখা কয়েকজন মহামানবের মিশ্রণে। সব্যসাচীর দুর্জয় সাহসী মনোভাবের পেছনে ছিল বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব। পৃথিবীর নানা দেশে যাওয়া ও বিপ্লবী সংগঠনের পেছনে ছিল বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব। নানা বিষয়ে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্তির পেছনে সক্রিয় থেকেছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তারকনাথ দাসের প্রভাব। সব্যসাচী দু'হাতে নিখুঁত লক্ষ্যে রিভলভার ছুঁড়তেন। এই লক্ষ্যভেদের আড়ালে রয়েছে বিপ্লবী সতীশ চক্রবর্তীর অবদান।

রাজনীতিক শরৎচন্দ্র মানুষের নানা দাবি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। শ্রমিকদের দুর্দশা ও তাদের রাজনৈতিক দাবি 'পথের দাবী'-তে স্পষ্ট। ব্রিটিশ-ভারত সরকার বইটি নিষিদ্ধ করে। করবে নাই-বা কেন? মহাবিপ্লবী সব্যসাচীর কথাতেই রয়েছে রাজনীতিক শরৎচন্দ্রের কথা— ''আমার কামনায়, আমার তপস্যায় আত্মপ্রবঞ্চনার অবসর নেই। এ তপস্যা সাঙ্গ হওয়ার শুধু দু'টি মাত্র পথ খোলা আছে— এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা।'' ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দুই সহোদর উমাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'পথের দাবী' প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র আমৃত্যু ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করেছেন। আবার দেশীয় শক্তির অত্যাচার জনমনে যে প্রবল ক্ষোভ সঞ্চার করেছে তাও এড়িয়ে যায়নি তাঁর কলম। তাঁর রচিত 'দেনাপাওনা' ও 'মহেশ' এরই প্রমাণ। কৃষকদের দুর্দশা ও বিদ্রোহ তাঁর রচিত 'ষোড়শী' নাটকে স্পষ্ট।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যে স্বাভাবিক। সাবলীল। রাজনীতির গ্রহণলাগা ঘোর প্যাঁচের জগতে তিনি কোনোদিনই খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি। সেবক শরৎচন্দ্র নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে দেশসেবা খুঁজে পেতেন। বিপ্লবী শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন আবেদন-নিবেদন নীতি নয়, বরং ভারতীয় বিপ্লবীরা রক্তপাত ও মৃত্যুকে সঙ্গী করে স্বাধীনতা আনবেন। সমাজ সংস্কারক শরৎচন্দ্র সমাজপতিদের অতি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ধ্বংস চেয়েছিলেন নিজের সচেতন রাজনৈতিক সত্তার কারণেই। নারীমুক্তির মাধ্যমে দেশজুড়ে শক্তির জাগরণও ছিল রাজনীতি, সমাজনীতি-সচেতন শরৎচন্দ্রের মানবিক প্রত্যাশা। তাঁর স্বপ্নের বিপ্লবী দেশনায়কের স্বরূপ বর্ণনা করে একমাত্র তিনিই লিখতে পারেন— 'তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও,— তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই তো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়;— কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল— সেই তো তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই তো ভগবান এত বড়ো বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটী নমস্কার!'

ভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এভাবেই স্বাধীনতার সঠিক পথের দাবি শরৎচন্দ্র উপস্থাপন করেছিলেন অনন্য দূরদৃষ্টি ও আপোশহীন সংগ্রামী মনোভাবের সাহায্যে। ◻

শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র কেবলমাত্র সাহিত্যিক ও রাজনীতিক নন; তাঁরা হয়ে ওঠেন একই সময়ের দুই স্বতন্ত্র অথচ পরস্পর-সম্পর্কিত স্বর। একজন মানুষের মনের ভিতর স্বাধীনতার গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছেন, অন্যজন সেই আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে কঠিন সাধনা ও আত্মনিবেদন করেছেন।

শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র

স্মৃতির ভেলায় সাহিত্য রাজনীতি ও মূল্যায়নে

সৈকত নিয়োগী

ইতিহাসের মহান মানুষদের আমরা সাধারণত তাঁদের কীর্তির ভিতর দিয়েই চিনি। শরৎচন্দ্র মানে বাংলা সাহিত্যের অমোঘ কথাশিল্পী, আর সুভাষচন্দ্র মানে স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্বার নেতা। কিন্তু কাছের মানুষের স্মৃতিতে তাঁরা আরও স্বাভাবিক, আরও মানবিক। রাধারাণী দেবীর স্মৃতিচিত্রে ধরা পড়া একটি বিকেল তাই ইতিহাসের বড়ো ঘটনাগুলির চেয়েও আলাদা এক আলোয় তাঁদের দেখতে শেখায়।

সময়টা সম্ভবত ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে। এক বিকেলে রাধারাণী দেবী ও তাঁর স্বামী অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছেন। শরৎচন্দ্র তখন বেরোনোর জন্য তৈরি— চুল আঁচড়ানো, কোট পরা, হাতে লাঠি। জরুরি একটি মিটিঙে যেতে হবে, সুভাষচন্দ্র তাঁকে নিতে আসবেন। অতিথিদের দেখে তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বললেন— কোনও অসুবিধা নেই, তাঁরা তো বেড়াতেই এসেছেন। শরৎচন্দ্র তবু তাঁদের বসতে বললেন।

কিছুক্ষণ পর গেটের সামনে মোটর এসে দাঁড়াল। সুভাষচন্দ্র নেমে জানালেন, তিনি একটু জল খাবেন। শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এক গ্লাস জলের ব্যবস্থা করতে তাঁর ছুটোছুটি দেখে উপস্থিত সকলেই কিছুটা অপ্রস্তুত। জল এল। তারপর দু'জনে বৈঠকখানায় বসে পড়লেন। আলোচনার বিষয় তখনকার উত্তপ্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস রাজনীতি।

রাধারাণী দেবীর চোখে দৃশ্যটির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল দুই ব্যক্তিত্বের পার্থক্য। শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে উদ্বেগ, অঙ্গভঙ্গিতে চাঞ্চল্য; সুভাষচন্দ্র ঠিক বিপরীত— শান্ত, স্থির, সংযত। অথচ শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রবীণ, সুভাষ তুলনায় অনেক তরুণ। এই উল্টো ছবিটিই উপস্থিত মানুষদের মনে দাগ কেটেছিল। শরৎচন্দ্র যেন সুভাষের সান্নিধ্যে নিজের বয়স ও প্রতিষ্ঠার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

এই সম্পর্কের শিকড় আরও পুরনো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতার সূত্র তৈরি হয়। সুভাষ তখন সদ্য আইসিএস ত্যাগ করে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। শরৎচন্দ্র ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক, পাশাপাশি হাওড়ার কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত। বয়স ও পেশায় দূরত্ব থাকলেও দেশের স্বাধীনতা নিয়ে তাঁদের ভাবনার মধ্যে একটি স্বাভাবিক সেতু তৈরি হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রকে শুধু সাহিত্যিক হিসেবে দেখলে তাঁর রাজনৈতিক সত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আড়ালে থেকে যায়। তিনি পেশাদার রাজনীতিক ছিলেন না, কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ও বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। সেই মনোভাব তাঁর সাহিত্যে বারবার এসেছে। 'পথের দাবী' তার সবচেয়ে শক্তিশালী দৃষ্টান্ত। বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসটি ১৯২৬ সালে প্রকাশের পর ব্রিটিশ-ভারত সরকার উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করে।

উপন্যাসের নায়ক সব্যসাচীকে পরবর্তীকালে অনেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিক্ষিত, বহুভাষী, সংগঠক, সাহসী ও আত্মসংযমী বিপ্লবী— সব্যসাচীর সঙ্গে সুভাষের ব্যক্তিত্বের কিছু আশ্চর্য মিল অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সরাসরি সুভাষকে সামনে রেখে 'সব্যসাচী' সৃষ্টি— এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়। 'পথের দাবী'র পরিকল্পনা সুভাষের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতার আগেই তৈরি হয়েছিল। বরং শরৎচন্দ্রের কল্পনায় নির্মিত আদর্শ বিপ্লবীর সঙ্গে পরবর্তী ইতিহাসের সুভাষচন্দ্রের মিলই এই সম্পর্ককে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

সুভাষচন্দ্র নিজেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের গভীর অনুরাগী ছিলেন। কারাবাসের সময় শরৎচন্দ্রের লেখা সুভাষের সঙ্গী হয়েছে বলে সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিচারণে উল্লেখ রয়েছে। ১৯২৯ সালের হাওড়া জেলা যুব সম্মেলনে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সুভাষের শ্রদ্ধার কথাও জানা যায়। তরুণদের সত্য ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝে প্রতিবাদ করার সাহস জোগানোর ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের ভূমিকা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্ক তাই ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার।

১৯৩৩ সালে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে নেমে আসে কঠিন সময়। অসুস্থতা ও ব্রিটিশ সরকারের চাপের কারণে তাঁকে ইউরোপে থাকতে হয়। তাঁর প্রতি রাজনৈতিক মহলের যথেষ্ট সমর্থন দেখা যাচ্ছে না— এই বিষয়টি শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত করেছিল বলে স্মৃতিচিত্রে উল্লেখ রয়েছে। সুভাষের আত্মত্যাগকে যথাযথ মর্যাদা না দেওয়ার জন্য তাঁর ক্ষোভ ছিল প্রবল। সক্রিয় রাজনীতি থেকে তাঁর সরে আসার পেছনে এই সময়ের অভিজ্ঞতার প্রভাব ছিল বলেও একটি সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর মধ্যে সুভাষের রাজনৈতিক উত্থান চলছিল দ্রুত। দেশবন্ধুর সহকারী হিসেবে কাজ, কারাবাস এবং বঙ্গীয় কংগ্রেসে সাংগঠনিক ভূমিকার পর তিনি সর্বভারতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে ওঠেন। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র। পরের বছর ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধী-সমর্থিত নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধ চরমে পৌঁছয়। কংগ্রেস সভাপতির পদ ছেড়ে পরে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন তিনি। শরৎচন্দ্র অবশ্য এই পরবর্তী অধ্যায়ের সাক্ষী হতে পারেননি। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাই কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের চোখে সুভাষ কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ের কিংবদন্তী 'নেতাজী' নন। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে সুভাষ ছিলেন এক তরুণ নেতা, যার মধ্যে শরৎচন্দ্র ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। আর সুভাষের কাছে শরৎচন্দ্র ছিলেন এমন একজন লেখক, যাঁর সাহিত্য মানুষের আত্মমর্যাদা ও প্রতিবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিল।

এই সম্পর্ককে শুধু সাহিত্যিক ও রাজনীতিকের বন্ধুত্ব বললে কম বলা হয়। এর মধ্যে ছিল একটি সময়ের স্বপ্ন, একটি প্রজন্মের অস্থিরতা এবং স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। শরৎচন্দ্র মানুষের মনকে সাহিত্যের মাধ্যমে জাগিয়েছেন; সুভাষ সেই জাগরণকে রাজনৈতিক সংগ্রামের শক্তিতে রূপ দিতে চেয়েছেন। তাঁদের পথ হয়তো এক ছিল না, কিন্তু তাঁদের সময় ও স্বপ্নের মধ্যে ছিল গভীর যোগ।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে সেই সম্পর্কের একটি অধ্যায় শেষ হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সামনে তখনও অপেক্ষা করছিল আরও কঠিন পথ— কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন, গৃহবন্দিত্ব থেকে পলায়ন এবং শেষপর্যন্ত আজাদ হিন্দ আন্দোলন। শরৎচন্দ্র এসব দেখে যেতে পারেননি। তাঁর স্মৃতিতে থেকে গেলেন সেই তরুণ সুভাষ, যাঁর মধ্যে তিনি অফুরন্ত কর্মশক্তি, সততা, আত্মত্যাগ এবং দেশের প্রতি গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখেছিলেন।

আজ তাঁদের দিকে ফিরে তাকালে তাই শুধু দু'জন কিংবদন্তীকে দেখা যায় না। দেখা যায় একটি সময়কে— যে সময়ে সাহিত্য ও রাজনীতি পরস্পরের থেকে দূরে ছিল না; যে সময়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য ছিল শিল্পীরও উদ্বেগ, রাজনীতিকেরও অঙ্গীকার।

শরৎচন্দ্রের কলম সাধারণ মানুষের ভিতরের প্রতিবাদকে ভাষা দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র সেই প্রতিবাদকে স্বাধীনতার সংগ্রামের বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁদের চলার পথ পরে আলাদা হয়েছে, ইতিহাস তাঁদের আলাদা পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবু তাঁদের সম্পর্কের স্মৃতি আজও ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে মনে করিয়ে দেয়। এছাড়াও তাঁদের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় যে, একটি যুগকে বুঝতে গেলে তার রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সেই সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলিকেও সম্যকভাবে অধ্যয়ন করতে হয়।

সেই পাঠেই শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র কেবলমাত্র সাহিত্যিক ও রাজনীতিক নন; তাঁরা হয়ে ওঠেন একই সময়ের দুই স্বতন্ত্র অথচ পরস্পর-সম্পর্কিত স্বর। একজন মানুষের মনের ভিতর স্বাধীনতার গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছেন, অন্যজন সেই আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে কঠিন সাধনা ও আত্মনিবেদন করেছেন। □

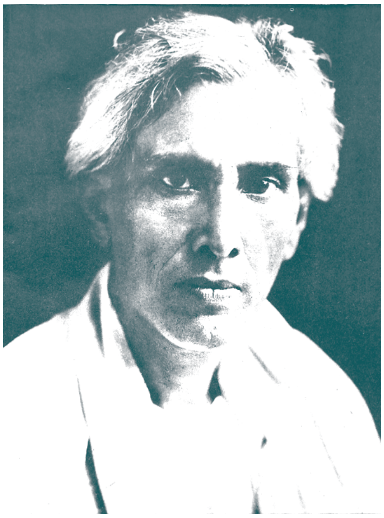

শরৎচন্দ্র

এক সংশয় কুণ্ঠিত সমীক্ষা

অমিত দাশ

কোনো বিশেষ সময়কালকে সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যাত করতে চাইলে কিছু মানুষের মনে ক্ষোভ সঞ্চারের সম্ভাবনা দেখা দিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চারটি দশককে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে মেনে নিতে কারও বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ণ সৃজনশীলতা নিয়ে যখন একটির পর একটি অনবদ্য রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে মর্যাদাস্থানে অধিষ্ঠিত করছেন, ঠিক তখনই আবির্ভাব শরৎচন্দ্রের। সূর্যাস্তই যখন চন্দ্রকিরণের সৌন্দর্য অবলোকনের একমাত্র শর্ত, তখন সাহিত্যমোদী মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন একই সঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের সহাবস্থান।

সাহিত্যপ্রতিভা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার বর্ণাঢ্যতার মাঝেই মেদুর আলোক বিচ্ছুরণে শরৎসাহিত্যের সিংহাসনে প্রতিভাত দেখা গেল যে মানুষকে, সে মানুষ বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, অভিজাত কিংবা ধনাঢ্য মানুষ নন। সে মানুষ লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অন্ত্যজ নিতান্ত সাধারণ মানুষ— 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃসময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই...।'

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মতোই কেউ বলতেই পারেন— 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর'।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে উপজীব্য করলেন এমনকী পতিতা— কলঙ্কিতাকেও।

সাহিত্যের সঙ্গে নন্দনতত্ত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদির যে সংশ্লেষ, সেখানে তথাকথিত অসুন্দর-অপাঙ্‌ক্তেয়কে সাহিত্যের আঙ্গিনায় নিয়ে এলেন কোন জাদুকাঠির ছোঁয়ায়, যথার্থ মানুষের করুণাধারার স্রোতে ভেসে গেল যাবতীয় অসুন্দর!

শরৎচন্দ্রের একটি স্বল্পপঠিত ছোটো গল্প 'বিচার'। গল্পের শুরুতেই রাজকুমারী যমুনাবতী তার পিতা অজয় সিংহের কাছে জানতে চাইছেন যে, তিনি কেন সিংহাসনে বসে বিচার করেন না। অজয় সিংহ উত্তর দিয়েছেন যে তিনি সিংহাসনে বসলে মানুষের বিচার করতে পারেন না, শুধু ক্ষমা করতেই ইচ্ছে হয়।

সাহিত্যের সিংহাসনে বসে শরৎচন্দ্র মানুষকে তাই ক্ষমাসুন্দর চোখেই দেখেছেন। এ তাঁর কোনো বিচ্ছিন্ন ভাবনা নয়। বলেছেন :

'মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, কেবল তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুলভ্রান্তি দিয়া মানুষের বিচার করিব, আর যে দেবতা সকল দুঃখ, সকল ব্যথা, সকল অপমান নিঃশব্দে বহন করিয়াও আজ স-স্মিত মুখে তাহারই মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তাঁহাকে বসিতে দিবার কোথাও আসন পাতিয়া দিব না? সেই কি মানুষের সত্যকার বিচার হইবে?'

এই ভাবনার পিছনে যুক্তি জানিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন যে, মানুষকে দোষী করবার আগে জানতে হবে কার্য-কারণ।

শরৎ-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা একান্তই হয়নি এমন নয়। নির্যাস যা উপলব্ধ হয়েছে তাতে শরৎচন্দ্র কারও কাছে দরদি-মরমি, কারও কাছে নারীবাদী সাহিত্যিক, কেউ-বা এমনকী পতিতাদের সাহিত্যিক অভিধায় ভূষিত করেছেন। বস্তুত এ-সবই তাঁর খণ্ড পরিচয়।

দরদি তো বটেই। দরদ না থাকলে বাঙ্গালি চরিত্র আঁকা যায়? শরৎচন্দ্রের দরদি মন মানুষকে অতিক্রম করে মনুষ্যেতর প্রাণী পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পেরেছিল বলেই দেওঘরের স্মৃতিতে নিছক রাস্তার কুকুর কিংবা যশোদা বোষ্টমীর কুকুরের জন্য চোখের জল ফেলাতে পেরেছেন। দরদি ছিলেন বলেই শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র জটিল, কুটিল, চরিত্রহীন বা নির্মম যাইহোক না কেন, সরাসরি না হলেও আড়াল থেকে একটি সজল করুণ দৃষ্টির কোমল আলো তাদের ক্ষণিকের জন্যও স্পর্শ করতে পেরেছে।

'মরমি' শব্দটিকে অভিধানে বলা হয়েছে— 'who has penetrated into the sacred mystery of the Universe'।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সবার চাইতে মানুষ দুর্গম। দুর্গম মানুষের গভীরে যেতে পেরেছেন বলেই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ চরিত্র তৈরি হতে পেরেছিল।

গৃহদাহ উপন্যাসে আমরা অচলা, সুরেশ

> "সমাজভাবনা-সাহিত্য ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। শরৎচন্দ্র নিজের শিক্ষক ও গুরু মেনেছেন রবীন্দ্রনাথকে। বলেছেন— 'আমার মতো কেউ করেনি তাঁর লেখার মকশো।'"

কিংবা মহিমের বাইরে কিন্তু ভাবতে পারি না। কিছু মৃণাল চরিত্রের গভীরতা তো যথার্থই 'sacred mystery'।

পতিতার কথা শরৎচন্দ্র লিখেছেন কিন্তু পতিত সাহিত্য রচনা করেননি। সংসারের টানাপোড়েন কিংবা মনুষ্যোচিত সাময়িক পদস্খলন কীভাবে নারীকে পতিতা করেছে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নিরুদিদি যেন তার এক প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য।

'চরিত্রহীন', 'দেবদাস' ইত্যাদি রচনায় শরৎচন্দ্র কীভাবে, কোথায় থামতে হবে, সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষায় সংযম যে কত প্রয়োজনীয় তা দেখিয়েছেন--- যা স্বয়ং রবীনন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন।

নারীবাদী লেখক হিসেবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করা অযথার্থ! নারীর দুঃখ-বেদনা-বঞ্চনা তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে— বেশি করে উঠেছে। কিন্তু 'নারীবাদী' শব্দটির মধ্যে পক্ষপাতিত্বের যে দ্যোতনা, তা সত্য হলে পাঠক কি খুঁজে পেতেন 'মেজদিদি'র কাদম্বিনীকে, রামের সুমতির দিগম্বরীকে? দৃষ্টি কতদূর প্রসারিত হলে আঁকা সম্ভব উল্লিখিত চরিত্রসমূহ। নারীর অহমিকা, বুদ্ধিহীনতা শরৎচন্দ্র দেখেননি তা নয়। 'দর্পচূর্ণ' গল্পে ইন্দু চরিত্রে তা নির্দিষ্ট করেও শেষরক্ষা করেছেন। নারীর হঠকারিতাও তার দুঃখ-বেদনার কারণ হয়ে উঠতে পারে 'মন্দির' গল্পের অপর্ণা যেন তার জ্বলন্ত নির্দশন।

কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন কুসংস্কার-অনাচার অন্যায়ের ইতিবৃত্ত রচনা করা সত্ত্বেও সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়নি শরৎচন্দ্রকে। বাল্যবিধবার দুঃখ বেদনা তুলে ধরেও বিধবা- বিবাহের চিত্র তো রচিত হয়নি তাঁর কলমে।

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা চিঠির উত্তরে বলেছেন, 'আমি কোথাও বিধবার বিবাহ দিই নাই। এইটি তোমার কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে। তার উত্তর এই যে সংসারে অনেক আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে এবং চেষ্টা করিয়াও তাহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।'

এমনকী হতে পারে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের জন্য যতটা প্রয়োজন, নারীকে তার বেশি কিছু দিতে চাননি। ভাবনাটি এত অশ্রদ্ধেয় যে যারা এমন বলেছেন, তারা লক্ষ্য করতে অক্ষম যে, নির্মম বাস্তবকে তুলে ধরে তিনি মানুষের বিবেকের দরজায় নাড়া দিতে চেয়েছেন, কারণ প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসবে মানুষের কাছ থেকেই। সমাধান খুঁজে দেবার জন্য বিচারকের আসনে বসলে বহু মানুষের সংক্ষোভ বিবেক জাগানোর প্রচেষ্টায় আঘাত হানবে--- সমস্যাকে জটিলতর করে তুলবে।

সাহিত্যের উচ্চাসনে বসে শরৎচন্দ্র সমাজজীবনের নানা সমস্যা থেকে দূরে থেকে সৃষ্টি-সাফল্যের উষ্ণতা পোহাতে চাননি। তখনকার একমাত্র জাতীয়তাবাদী দল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। সাহিত্যিক মানুষের রাজনীতিতে যাওয়া বিসদৃশ, এমন মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রশ্ন করেছেন, তাহলে কি রাজনীতিকেও একটি পেশা করে তোলা হবে? আজকের দিনে শরৎচন্দ্রের ক্ষোভের যথার্থতা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারছি।

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, পশ্চিমের যারা নিন্দা করেন, তারা কি অস্বীকার করবেন যে পশ্চিম জয়ী হয়েছে। পশ্চিমের কোনো সদর্থক বাণী না থাকলে পশ্চিমি সভ্যতা জয়ী হতে পারত?

'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বললেন জয়ী হওয়াই সার্থকতা নয়। কপট পাশাখেলায় দুর্যোধন-শকুনি পাণ্ডবদের পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তারা কি মহৎ?

রবীন্দ্রনাথ একবার ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের রচনার ভঙ্গিতে। শরৎচন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আহত হয়েছেন জেনে।

পরবর্তীকালে দু'জনেই ভাবনায় কিছু কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন।

'পথের দাবী'র ভারতী, 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমলার কথায় পশ্চিম সম্পর্কে যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তা রবীন্দ্রভাবনার অনুগামী। এমন মিলনের কথা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দও।

জীবনের শেষ জন্মদিনে 'সভ্যতার সংকট' ভাষণে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গের কথা জানিয়েছেন। তখন অবশ্য জীবনাবসান ঘটেছে শরৎচন্দ্রের।

ভারতবর্ষের সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কে স্পষ্টবাদী ছিলেন শরৎচন্দ্র। ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে তাঁর মন্তব্যসমূহ আমাদের বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প 'মহেশ'-এ গরিব মুসলমান চাষি গফুর ও তার কন্যা আমিনার বেদনার কথা লিখে জাতি-ধর্মের বেড়াকে অতিক্রম করে গেছেন। যাঁকে তাঁর পরমশত্রুও মুসলমান বিদ্বিষ্ট বলতে পারবে না, সেই শরৎচন্দ্রই বুঝেছিলেন, 'হিন্দু-মুসলমান-মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে তো সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের পরে।'

স্পষ্ট বলেছিলেন, 'মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,— এ দেশে চিত্ত তাহার নাই।'

তথাকথিত ভালো মুসলমান শব্দটির প্রতিও কোনো আস্থা ছিল না শরৎচন্দ্রের। সচরাচর নজরুল ইসলাম, রেজাউল করিম প্রমুখের নজির দেবার সময় ভুলে যাওয়া হয় তাঁরা যথার্থই আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু । শরৎচন্দ্রের এতে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। বলেছেন, 'হিন্দুনারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এতবড়ো অপরাধ করিতেছে তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কীসের জন্য? মুখ বুজাইয়া নিঃশব্দ থাকার অর্থ কী?

কিন্তু আমার তো মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু আপত্তি করব কী, সময় ও সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।'

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে শরৎচন্দ্রের ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনারও কোনো তফাত ছিল না। তন্নিষ্ঠ রবীন্দ্রপাঠে তা প্রমাণ করাও কঠিন নয়।

বস্তুত সমাজভাবনা-সাহিত্যভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। শরৎচন্দ্র নিজের শিক্ষক ও গুরু মেনেছেন রবীন্দ্রনাথকে। বলেছেন— 'আমার মতো কেউ করেনি তাঁর লেখার মকশো।'

আর 'সাধারণ মেয়ে'র কথা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট চরিত্র বলেছে, 'ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।'

সার্ধশতবর্ষে পাতার পর পাতা লিখেও উল্লিখিত 'এত বড়ো সম্মান' শরৎচন্দ্রকে দিতে পারা সম্ভব নয় দেশবাসীর। □

হিন্দু বিরোধী হিন্দুদের থেকে সাবধান!

'গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ' ক্ষমাও চাইতে পারে। তাতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা যেমন থাকে, তেমনি তার দায়বদ্ধতার দায়িত্বও থাকে। সংবাদপত্রের কোনো সংবাদ বা শিরোনামে যদি তথ্যগত ভুল থাকে, অযথা অপমানজনক বা বিভাজনমূলক ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে সংবাদমাধ্যম ভুল স্বীকার করে সংশোধন এবং প্রয়োজনে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে পারে। এতে তার মর্যাদা কমে না; বরং বিশ্বাসযোগ্যতা ও দায়িত্বশীলতা বাড়ে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের স্বাধীনতা যেমন জরুরি, তেমনই তার ভুলের জন্য জবাবদিহিও জরুরি; প্রয়োজন হলে ক্ষমা চাওয়াও সেই জবাবদিহিরই অংশ।

সম্প্রতি যাদবপুরের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় 'গেরুয়া গুন্ডামি' শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই শব্দচয়ন নিয়ে আপত্তি জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমকে শব্দবন্ধটি প্রত্যাহার এবং ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। গেরুয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিসরে ত্যাগ, সংযম, সন্ন্যাস ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত একটি প্রতীক। আবার মিডিয়ার কল্যাণে সমকালীন রাজনীতিতে এই শব্দটি হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেছে। ফলে 'গেরুয়া গুন্ডামি' বললে তা কি কেবল কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীদের আচরণকে বোঝায়, নাকি বৃহত্তর একটি ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে 'গুন্ডামি' শব্দটিকে জুড়ে দেয়— সেটাই আসল প্রশ্ন!

হিন্দুদের একটি অংশ মুসলমানদের অপেক্ষাও হিন্দুদের সবচেয়ে বড় বিরোধী। বিশেষ করে শহুরে নকশাল, দিমাগি নকশালপন্থীরা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়েন। এঁরা কারণে অকারণে হিন্দু ধর্মকে ছোটো করে নিজেদের প্রগতিশীল রূপে জাহির করেন। এঁরা শিবের মাথায় কন্ডোম পরানোর কথা বলেন। কবি শ্রীজাত তাঁর 'অভিশাপ' কবিতায় ধর্মের ত্রিশূলে কন্ডোম পরানোর মতো শব্দবন্ধ ব্যবহার করে কবিতার অলংকার বৃদ্ধি করেছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'প্রথম আলো' উপন্যাসে মা কালীকে পৌরাণিক বা স্বর্গীয় দেবী হিসেবে মানতে চাননি। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, 'আগমবাগীশ নামে এক পণ্ডিত কোনো জনজাতি রমণীর শরীরের গড়ন দেখে এই মূর্তি রূপ দিয়েছিলেন। তন্ত্রবিশ্বাসী বাঙ্গালিরা ছাড়া বাকি ভারতীয় হিন্দুরা এই নগ্নিকা মূর্তিকে এখনো দেবী হিসেবে গ্রহণ করেনি।' বাম ও অতিবামেরা দুর্গাপূজার ধর্মীয় পরিচয়কে আড়াল করে তাকে নিছক একটি 'শারদোৎসব'-এ পরিণত করে ফেলেছেন। অরুন্ধতী রায়ের আজাদি গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এঁরা কাশ্মীরের 'আজাদি' বা স্বাধীনতার দাবি করেন। আর এসবের প্রতিবাদ করতে গেলেই সেটা হয় 'গেরুয়া গুন্ডামি'। বড়োই বিচিত্র এই দেশের শহুরে নকশালরা। এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

—অজয় ভট্টাচার্য,
বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি বিনীত আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি আয়ুষ বিভাগে কর্মরত ডাক্তারদের একটা বড়ো অংশ জিপি লেভেল বা গ্রামের সদর চিকিৎসা কেন্দ্রে কর্মরত। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে জেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা ডাক্তারবাবুরা নিযুক্ত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মানুষদের নিজের এলাকায় পরিষেবা দেওয়া। এই কাজে প্রায় ১৭০০ আয়ুষ স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রত্যহ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত রোগী দেখেন। কিন্তু বিগত নির্মম সরকারের সময় এই চিকিৎসাকেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তারদের প্রতি চরম অবহেলা করা হয়। বেতন কাঠামো নিম্নমানের, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কিছুই ছিল না। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক আয়ুষ ডাক্তার প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা রোগী দেখা, কম্পিউটারে তথ্য আপলোড করা, ওষুধ দেওয়া, এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন ন্যাশনাল স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা, outreach camp ইত্যাদি সব করেন।এই জিপি লেভেল আয়ুষ ডাক্তারদের কোনো ফাইল বিগত নির্মম সরকারের সময় অনুমোদন দেওয়া হয়নি কিন্তু বিগত পনেরো বছরে সময়ে সময়ে ছোটো ছোটো সংখ্যায় মোটা বেতনের পোস্ট বের করে স্বজন পোষণ করা হয়েছে।

বর্তমানের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন কর্মবীর। তাঁর কাছে বিনীত নিবেদন, এই বিপুল সংখ্যক আয়ুষ ডাক্তারদের দ্রুত যোগ্য সম্মান দিয়ে গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আরও বেশি করে কাজে লাগানো হোক যাতে কথায় কথায় রোগীদের শহরে হাসপাতালে যেতে না হয়। আমরা নিশ্চিত যে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিতভাবে এই বিষয়টি দেখবেন এবং কর্মরত ডাক্তারদের পাশে দাঁড়াবেন।

—ডাঃ সমরজিত ঘটক,
এএমও, সোনারপুর।

ক্ষমতা নয়, ত্যাগ হোক লক্ষ্য

রাজ্য গৈরিকময় হয়েছে। এসেছে নতুন সরকার। নবনির্বাচিত সরকারের কাছে বঙ্গবাসীর অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। নবাগত সরকারের প্রতি সেকু-মাকুদের রাগ থাকলেও খুশি কিন্তু সাধারণ মানুষ। সব কিছুর মধ্যে মোদ্দাকথা হলো এই বঙ্গবিজয়ের পরিকল্পনা কিন্তু বহু দিনের। ২০১১ সালের ইন্ডিয়া এগেনস্ট করাপশন সোনিয়া গান্ধী ও আন্না হাজারের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। আন্না হাজারের অনশন ও আন্দোলনের মুখে সরকার যৌথ খসড়া কমিটি গঠনে বাধ্য হলেও পরে বিলের রূপরেখা এবং কংগ্রেস নেতাদের মন্তব্য

নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় চিঠি চালাচালিতে মতোবিরোধ ঘটে। আর এই ঘটনার বিরোধিতা করে আন্না হাজারেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। সেই ঢেউ আছড়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গেও। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে উঠে আসে একাধিক এবিভিপি ছাত্রনেতা। এই ছাত্র নেতাদের মধ্যে বেশিরভাগই আজ বঙ্গ বিজেপির এমএলএ এবং এমপি। তবে এখন প্রসঙ্গ হলো শুধুমাত্র টিএমসির অরাজকতা শুধু বঙ্গজয়ের কারণ নয়, বঙ্গজয়ের নেপথ্যের কারিগর সাধারণ মানুষ, এটাই বাস্তব।

নবনির্বাচিত সরকারের বদান্যতায় ইমার্জেন্সিতে জেলখাটা লোকতন্ত্র সেনানীরা পেলেন তাদের যোগ্য সম্মান। এতদিন অবহেলার পর এরকম দিন আসবে এটা তো ভবিতব্য। লোকতন্ত্র সেনানীদের অবদান ভারত ইতিহাসে অনস্বীকার্য। এক কথায় যাকে বলে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। তারপর শ্রীরামমন্দির আন্দোলন ও তিনবিঘা আন্দোলন সঙ্ঘের ভিত্তি আরও মজবুত করে। বারবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও আজ সঙ্ঘ একশো বছর পার করেছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুজাগরণের পেছনে প্রবীণ স্বয়ংসেবকদের অবদানের পাশাপাশি সমাজে মানুষের অবদানও কম নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে এই জয় কি সীমিত থাকবে নাকি সমগ্র পৃথিবী হবে গৈরিকময়? রাজ্য জয়ের পর থেকে তৃণমূলের চোরেরা বিজেপিতে আসার জন্য যে দৌড় শুরু হয়েছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। খবরের পাতা ও সোশ্যাল নেটওয়ার্কে একরকম খবরের ছড়াছড়ি। এই কলরবের মধ্যে আমরা কোথাও মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছি না তো! এই বিষয়টি এখন ভাববার সময় এসেছে। প্রথম কথা হলো সঙ্ঘ রাজনৈতিক প্লাটফর্ম নয়, সেটা সকলের পরিষ্কার করে ভাবে বোঝা দরকার। সঙ্ঘে এলে কিছুই পাওয়া যাবে না, বরং দিতে হবে সর্বস্ব, এই বিষয়টি মাথায় রেখে যদি সবাই সঙ্ঘে আসেন তবেই ভালো।

—**চিন্ময়ী দে রায়,**
জলপাইগুড়ি।

মৃত্যুতে জীবনের জয়গান

কিছুদিন আগেই ক্ষুদিরাম বসুর ১১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পার করে এলাম। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তার ফাঁসি হয়। মানুষের জীবনে অমূল্য সম্পদ হচ্ছে তার জীবন কিন্তু সেই জীবনকেই ক্ষুদিরাম বসু হাসতে হাসতে দেশের জন্য সমর্পণ করার যে প্রেরণা আমরা দেখতে পেলাম সেটা নতুন প্রজন্মের কাছে অনন্য উদাহরণ। আজকের যখন মানুষ ভোগবাদের ভাবনায় আচ্ছন্ন, দুর্নীতি ও অপসংস্কৃতিতে লিপ্ত, সে সময়ে ভাবতে অবাক লাগে মাত্র ১৮ বছর বয়সের এক কিশোর দেশের জন্য প্রাণ দিতে পিছপা হয়নি। সকলেই জানে অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে দুজন বিপ্লবীকে বাছা হয়। তারা হলেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। তারা জানতেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন মানসিকতা তাদের তৈরি হয়েছিল যে মৃত্যুভয়ও তাদের বিচলিত করতে পারেনি। কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে বিপ্লবীরা ভুল করেন এবং তাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় কেনেডি পরিবারের দুই মহিলা মারা যায়। পালিয়ে যাওয়ার পথে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে যান ব্রিটিশ পুলিশের হাতে। অন্যদিকে প্রফুল্ল চাকী ধরা না দিয়ে আত্মঘাতী হন। অল্প বয়সেই ক্ষুদিরামকে ব্রিটিশ প্রশাসন দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যু দণ্ড ঘোষণা করে। আশ্চর্যজনক ভাবে ফাঁসি ঘোষণা হওয়ার পরেই দেখা যায় ক্ষুদিরাম বসুর ওজন বেড়ে গেছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে ক্ষুদিরাম বসু জানায় সে গীতা পড়েছে, সেখানে লেখা আছে শরীরের মৃত্যু হতে পারে কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট জেলে তার ফাঁসি হয়।

আসলে ক্ষুদিরাম ছোটো থেকে ছিল অকুতোভয়, পরোপকারী, কুসংস্কার বিরোধী দেশপ্রেমী তরুণ। বড়দিদি অপরূপাদেবী তাকে তিন মুঠো খুদের বিনিময়ে কিনেছিল, তার নাম ক্ষুদিরাম হওয়ার পিছনে এমন একটি জনপ্রিয় কাহিনি প্রচলিত আছে। মেদিনীপুরে থাকাকালীন তার বিপ্লবী জীবনের শুরু। তাঁর বিপ্লবী জীবনের শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তার জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। নির্ভীক দেশপ্রেমী ক্ষুদিরামকে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত দেখে সমকালীন মানুষ বিস্মিত হয়েছিল। আজ ক্ষুদিরাম নেই কিন্তু তার আত্মত্যাগের স্মৃতি রয়ে গেছে। তরুণ প্রজন্মের উচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং তাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জানা, তাহলেই সার্থক হবে ক্ষুদিরামের মতো বিপ্লবীদের দেশের জন্য আত্ম বলিদান।

—**তন্ময় পণ্ডিত,**
কাঞ্চনতার, মালদা।

বিষধর বুদ্ধিজীবী

কয়েক দশক আগে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জেহাদিদের আবেদনে মানবতাবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরকারি উদ্যোগে কলকাতা ত্যাগ সুনিশ্চিত করা হয়। আবার মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের শীতঘুম বা ভাতঘুম থেকে জেগে উঠতে দেখা যায়নি, যতই বানতলা, আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা ইত্যাদি ঘটুক না কেন। আবার নিরপেক্ষ ও পদকধারী বুদ্ধিজীবীরা পদক ও পয়সার হাতছানি না এলে প্রতিবাদে নামেন না। এ হলো বাস্তব সত্য। তাই পূর্ববঙ্গে সরকারি উদ্যোগে হিন্দু নির্মূলীকরণ ও মুক্ত মনের মানুষজন হত্যার অভিযান শুরু হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কলম ধরতে বা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সভা করতে দেখা যাচ্ছে না। প্রমথ বিশী কয়েক দশক আগে ছড়ার ছলে বলেছিলেন, তা আজও সমান ভাবে প্রযোজ্য, আর তা হলো— 'আমিন ভালো জমিন ভালো, ভালো শহর ঢাকা। সবার চাইতে ভালো রে ভাই হিন্দু পল্লী ফাঁকা।' এখন তো ভয়ের পরিবেশ নেই পশ্চিমবঙ্গে, তবুও প্রতিবাদে অনীহা দেখাচ্ছে কেন? গাজায় হামলা চললে যেভাবে সোচ্চার হন, এখন নয় কেন?

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

চাকুরীজীবী মহিলারাও সংসারের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারেন

নিবেদিতা কর

একবিংশ শতাব্দীতে বারবার এই প্রশ্ন উঠেছে, মেয়েরা কেন চাকুরি করে স্বাবলম্বী হবে না? তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্টো প্রশ্নটাও ওঠে, বিয়ের পর মেয়েরা কেন বাইরে বেরিয়ে চাকরি করবে? এই দুই প্রশ্নই আসলে উঠে আসে দুইরকম মনস্তত্ত্ব থেকে। কিছু মহিলা মনে করেন উপার্জন না করলে নিজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে না, সব ক্ষেত্রে স্বামীর উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় ও নিজের পরিচিতি বলে কিছু থাকে না; কিংবা সমাজ ও সংসারে নিজের কোনো অবদান থাকে না। অপরপক্ষে কিছু পুরুষ কিংবা শাশুড়ি স্থানীয় মহিলারা মনে করেন বাড়ির বৌ চাকরি করলে অতিরিক্ত স্বাধীন হয়ে যাবে এবং ছেলের অধীনে থাকবে না; কিংবা সংসারের দায়িত্ব পালন করবে না। এই সকল বিশ্লেষণের জন্য চলে যেতে হবে একটু পিছনের সময়ে যে সময়টায় মেয়েরা চাকুরি করবে এমনটা সমাজে ভাবাই যেত না; এমনকী মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণেও বাধা ছিল। এই সময়েই মা সারদামণির মতো একজন গ্রামের সাদামাটা নারীও মনে করতেন মেয়েদের স্বাবলম্বী না হয়ে বিবাহ করা উচিত নয়। বিবাহিতা নারী তাঁর পরিবার ও সমাজের প্রতি কীরূপ অবদান রাখবে— সেই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর লেখা বই 'ভারতীয় নারী'তে বলে গেছেন। তিনি চাইতেন ঘরে-ঘরে শিক্ষিত,স্বাবলম্বী, উপার্জনশীল, আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় চিত্তের নারী হবেন কিন্তু তাঁরা তাঁদের সন্তান,স্বামী, শ্বশুরবাড়ির প্রতি কর্তব্যে অনড় হবেন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং আধুনিকতার মেলবন্ধন হবে ভারতীয় নারী। এমনটাই চেয়েছিলেন স্বামীজী। অর্থাৎ মেয়েরা প্লেন চালাবে, জাহাজও চালাবে। কিন্তু দিনের শেষে বাড়ি ফিরে সেই নারীরা যেন তাঁদের মাতৃসত্তা না ত্যাগ করেন, তাঁরা নিজের স্বামী সন্তানকে যেন ভুলে না যান; কারণ একজন মা-ই হলেন পরিবারের খুঁটি এবং তাঁর আত্মত্যাগের মাধ্যমেই পরিবার টিকে থাকে। মায়েরা হাল ছেড়ে দিলে সংসার ও সমাজ বিপথে চলে যায়।

চাকুরি এক প্রকার দায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে সব থেকে ভালো উদাহরণ হিন্দুদের পরমারাধ্যা— ত্রিদেবী অর্থাৎ মা দুর্গা,মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতী। পুরাণে উল্লেখিত আখ্যান অনুযায়ী এঁরা কেউ নিপাট গৃহবধূ ছিলেন না কিংবা স্বামীর পরিচয়েই এঁরা কেউ পরিচিত হতেন না। মহাশক্তির বিভিন্ন রূপ এই দেবীরা সকলের নিজস্ব পরিচিতি ছিল কর্ম ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। দেবী দুর্গা সামলাতেন দিব্যজগতের প্রতিরক্ষা বিভাগ, দেবী লক্ষ্মী সামলাতেন অর্থনৈতিক বিভাগ এবং দেবী সরস্বতী সামলাতেন শিক্ষা বিভাগ। দিব্যজগতের তিন বিভাগের অধীশ্বরী এই ত্রিদেবী। কিন্তু প্রশ্ন হলো, স্বাবলম্বী বা ব্যক্তিত্বপ্রবণ নারীদের স্বামীরা কেমন হবেন? মহিষাসুরের মতো নারীবিদ্বেষী? নাকি শুম্ভ-নিশুম্ভের মতো এই ধারণায় বিশ্বাসী যে নারীরা পুরুষের অধীনস্থই থাকবে; তার স্বাধীন হওয়া মানায় না। আসলে ব্যক্তিত্বপ্রধান, দৃঢ় চিত্তের নারীদের সামলাতে পারতেন একমাত্র পরমপুরুষরাই; তাই ভগবান শিব, ভগবান শ্রীবিষ্ণু, প্রজাপিতা ব্রহ্মা, শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণের মতো অসীম শক্তির অধিকারী, অহংকারহীন,জ্ঞানী, ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল, সমর্পিত হৃদয়সম্পন্ন, পথপ্রদর্শক, সকল বিষয়ে উৎসাহদায়ক, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষদের প্রয়োজন আছে এই সমাজে।

ভগবান শিব ও শ্রীবিষ্ণুই নিরীহ পার্বতীকে মা কালী হতে সাহায্য করেছিলেন। আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দ্রৌপদীর মতো অসীম শক্তির অধিকারী, ব্যক্তিত্বপূর্ণা নারীকে 'চক্রবর্তী সম্রাজ্ঞী' হয়ে বিশাল ইন্দ্রপ্রস্থ সাম্রাজ্যের সকল অর্থনৈতিক কর্ম সামলাতে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু দেবী পার্বতী কিংবা মহাভারতের দ্রৌপদী কেউই দিন শেষে নিজ কর্ম ও দায়িত্ব পালনের পরেও সংসারধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, কারণ তাঁদের পাশে ছিলেন উৎসাহদায়ক ও সহমর্মী জীবনসঙ্গীরূপে উদার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহৎ স্বামীগণ। এই সকল বিশ্লেষণ শেষে এইটুকুই বলা যায় যে, মেয়েরা অবশ্যই চাকুরি করবে, স্বাবলম্বীও হবে, নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলবে; সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল দায়িত্বও নেবে, কিন্তু এক পর্বতসম, পরমবন্ধু পুরুষকে জীবনসঙ্গী হিসাবে সেই নারীর পাশে থাকতে হবে যিনি নিজের স্ত্রীকে দুঃসময়ে কোনোভাবেই ছেড়ে যাবেন না, স্ত্রী কালীরূপ ধারণ করলে শিবের মতো বুক পেতে দিতেও দ্বিধা করবেন না। সংসারের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করতে স্ত্রীকে তাঁর স্বামী সর্বতোভাবে সর্বদা সহযোগিতা করবেন, কারণ সংসার এমন এক প্রতিষ্ঠান যার ভার দু'জনকে এমন ভাবে বইতে হবে যাতে একার বোঝা না বেড়ে যায়; যাতে দিন শেষে কেউ যেন ক্লান্তিতে হারিয়ে না যায়। ভারতীয় ধারণায় মা কালী হলেন মহাশক্তি এবং ভগবান শিব হলেন সর্বশক্তিমান। নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক, একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। ◻

কেটে রাখা পেঁয়াজ খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অনেকেই সময় বাঁচানোর জন্য পেঁয়াজ কেটে সংরক্ষণ করেন। কেটে রাখা এসব পেঁয়াজ প্রয়োজন অনুযায়ী পরে রান্নার কাজে ব্যবহার করেন। কেটে রাখা পেঁয়াজ খাওয়া কিন্তু মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।

পেঁয়াজ বিদ্যমান সালফারের জন্য পেঁয়াজ কাটলে চোখে জল আসে। পেঁয়াজ কেটে বাইরে রেখে দিলে সালফার উপাদান বাতাসের সংস্পর্শে এসে দ্রুত ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি করে এবং পুষ্টিগুণ নষ্ট করে এবং খাবারের বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যার ফলে মাথাব্যথা, বমি ও পেটব্যথার কারণ হতে পারে। পেঁয়াজ কেটে রেফ্রিজারেটারে রাখলে পেঁয়াজের সালফার রেফ্রিজারেটারের ঠাণ্ডা ও আর্দ্রতার সংস্পর্শে দ্রুত ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি করে। শুধু তাই নয়, খোসা ছাড়িয়ে আস্ত পেঁয়াজও রাখা উচিত নয়। অনেকে ভাবেন রং, গন্ধ ও ঝাঁঝ ঠিক থাকলে কাটা পেঁয়াজ ব্যবহার করা যাবে। আসলে তা ঠিক নয়। কারণ, পেঁয়াজ কাটার পর দেখা যায় এর আর্দ্রতা খুব তাড়াতাড়ি কমে শুকিয়ে যায়, যার অর্থই হলো এর উপকারী উপাদান সালফার বাতাসের সংস্পর্শে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করছে। পেঁয়াজ কেটে সংরক্ষণ না করাই সবচেয়ে ভালো। এমনকী কেটে বা খোসা ছাড়া তা এক রাতের জন্যও রাখা উচিত নয়।

যথাসম্ভব রান্না করার সময় পেঁয়াজ কেটে রান্না করাই উচিত। অনেকেই পেঁয়াজ কেটে পলিথিন বা জিপ লক ব্যাগে রাখেন, এতেও ব্যাগের ভেতরে বাতাস এবং পেঁয়াজের রস ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। তারপরও একান্তই যদি সংরক্ষণ করতে হয়, সে ক্ষেত্রে পেঁয়াজ কেটে বায়ুরোধী কাচের বয়ামে ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৪ দশমিক ৪ ডিক্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পেঁয়াজ খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি নানাবিধ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ, তাই যথাসম্ভব পুষ্টিগুণ ঠিক রেখে ব্যবহারের প্রতি সবার সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সুস্থ থাকতে তোয়ালে ব্যবহারে সঠিক যত্ন নিন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তোয়ালে ও গামছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জানেন কি, তোয়ালের সঠিক যত্ন নিলে জীবাণু সংক্রমণ থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া যায়? অধিকাংশ সময়, সঠিক ভাবে শুকনো বা নিয়মিত পরিষ্কার না করা তোয়ালে আমাদের শারীরিক সমস্যার কারণ হতে পারে।

● স্নান করার পর ৩-৪ বার ব্যবহারের পর ধুয়ে ফেলুন। ● হাত মুছতে ব্যবহৃত তোয়ালে ১-২ দিন অন্তর ধোয়া উচিত। ● জিমের তোয়ালে প্রতিবার ব্যবহারের পর ধুয়ে ফেলুন। ● মুখ মোছার তোয়ালে প্রতিদিনই ধুয়ে ফেলুন।

এই নিয়ম মেনে চললে আপনার তোয়ালে জীবাণুমুক্ত থাকবে এবং বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি কমবে। তোয়ালে পরিষ্কার রাখার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ :

● তোয়ালে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিস, তাই অন্য কাউকে এটি ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়। এতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ● ভেজা তোয়ালে ব্যবহার করলে জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ব্যবহার শেষে তোয়ালে ভালো ভাবে শুকিয়ে রাখুন। ● তোয়ালে ব্যবহারের পর ভালো ভাবে টান টান করে শুকিয়ে রাখুন। এতে তোয়ালে দ্রুত শুকাবে এবং জীবাণু বৃদ্ধির সুযোগ কম হবে।

● তোয়ালে ধোয়ার জন্য গরম জল ব্যবহার করুন, কারণ গরম জলে জীবাণু ধ্বংস হয়। ঠাণ্ডা জলে ধোয়া তোয়ালে জীবাণু সঠিক ধ্বংস হয় না। ● তোয়ালে ব্যবহারের পর যদি সেটা নরম না থাকে, তবে আর ব্যবহার না করাই ভালো। এ ধরনের তোয়ালে ত্বককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ● প্রতি বছর অন্তত একবার তোয়ালে বদলানো উচিত। পুরনো তোয়ালে আর কার্যকরী নয় এবং তা জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয় হতে পারে।

তোয়ালে পরিষ্কার রাখার এই সহজ নিয়মগুলি মেনে চললে, আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন এবং বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাবেন। □

শিক্ষক দিবসে খড়দহ শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সম্মাননা অনুষ্ঠান

গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দহ শিবনাথ স্কুলে শিক্ষক সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাতে ১০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মাননা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সম্পাদক মিলন খামারিয়া, সভাপতি ডঃ সুশান্ত মজুমদার, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত দুই বিশিষ্ট শিক্ষক দেবব্রত দাস এবং শ্রীমতী শুক্লা রায়। এছাড়াও ছিলেন প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক দীনেশ সরকার-সহ কল্যাণনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আইডিয়াল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং ভবনাথ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণা, সোদপুর-এর প্রধান শিক্ষক, অ্যাকাডেমিয়ার অয়ন এবং শতদল, সন্দীপ, পাতুলিয়া ও খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও সমাজের প্রতি অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৫টি সামাজিক সংগঠনকে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সদস্য শ্রীমতী জীতা লাহিড়ী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ছন্দা হালদার ও শৈবাল হালদার।

শ্রীশ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ১২৫তম আবির্ভাব জয়ন্তী মহোৎসব

রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীশ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ১২৫তম আবির্ভাব জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বর্ষব্যাপী (২০২৫-২০২৬) মহোৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই বর্ষব্যাপী মহোৎসব পালনের কর্মসূচি প্রেম মন্দির এবং তার সমস্ত শাখাকেন্দ্রে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এই পুণ্য কর্মযজ্ঞের অঙ্গ হিসেবে, শ্রীবালানন্দ ধর্মসঙ্ঘ (কলকাতা শাখা)-র উদ্যোগে গত ৩০ আগস্ট মধ্য কলকাতায় ঐতিহ্যবাহী মহাজাতি সদন সভাগৃহে একটি মহতী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আচার্য শ্রীশ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের স্মরণ-মনন, ধর্মসভা ও ভক্তিগীতির এই ভাবগম্ভীর সন্ধ্যায় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে গৌরবমণ্ডিত করে তোলেন পশ্চিমবঙ্গের মহামহিম রাজ্যপাল শ্রী আরএন রবি মহাশয়। শ্রীশ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, প্রেম মন্দির আশ্রম ও প্রেম মন্দির জনকল্যাণ সমিতি সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এদিনের অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথি— 'মহানাম অঙ্গন'-এর সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ণমন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু।

সংস্কার ভারতী-র শিল্পীদের পরিবেশিত ভক্তি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর সমবেত কণ্ঠে রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্' ও জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর পর শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের দিব্য জীবন অবলম্বনে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর মহামহিম রাজ্যপাল আরএন রবি, প্রেম মন্দির আশ্রমের সহ-অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন হয়। মঙ্গলমন্ত্র পাঠ করেন সঙ্গীতশিল্পী নির্মাল্য রায়। মহামহিম রাজ্যপাল-সহ বিশিষ্ট অতিথিদের বরণ করে নেন শ্রীবালানন্দ ধর্মসঙ্ঘ, কলকাতা শাখা-র সদস্যবৃন্দ। এরপর স্বাগত ভাষণ দান করেন শ্রীবালানন্দ ধর্মসঙ্ঘ, কলকাতা শাখা-র সভাপতি অভিজিৎ নন্দী। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল— 'আচার্য প্রবর শ্রীতারানন্দ'। এরপর ভারতীয় শিক্ষা পরম্পরা— 'আচার্যদেবো ভব' বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন 'প্রেম প্রবাহ' পত্রিকার সম্পাদিকা ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যপাল ও বিশিষ্ট অতিথিদের বক্তব্য শেষে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ কৌশিক দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রেম মন্দির আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রবীর ভট্টাচার্য্য।

জন্মাষ্টমীতে মুর্শিদাবাদে শিশুমন্দিরে গোপাল সাজো প্রতিযোগিতা

গত ৪ সেপ্টেম্বর দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে এবং রুটি মহলের সরস্বতী শিশুমন্দিরের সহযোগিতায় শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো 'গোপাল সাজো' প্রতিযোগিতা। মুখ্য অতিথি তথা বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক, কবি, ঔপন্যাসিক ডঃ রতন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন ডোমকল মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মধুসূদন মণ্ডল, স্থানীয় সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য সুদীপ্ত ব্রহ্মচারী। গোপাল সাজো প্রতিযোগীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তারপর গোপাল সাজো প্রতিযোগিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সিদ্ধার্থশঙ্কর আচার্য।

উলুবেড়িয়া অ্যামেচার অ্যাকোয়াটিক ক্লাবের উদ্যোগে সাঁতার প্রতিযোগিতা

উলুবেড়িয়া অ্যামেচার অ্যাকোয়াটিক ক্লাবের উদ্যোগে এবং ক্রীড়া ভারতী হাওড়া জেলার ব্যবস্থাপনায় গত ৬ সেপ্টেম্বর উলুবেড়িয়ায় এক সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সভাপতি ডঃ রবিকার পাল এবং ক্রীড়া ভারতীর হাওড়া বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করে প্রতিযোগিতা শুরু করেন। ১৭টি ইভেন্টের বিভিন্ন বয়সের ৭০ জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করেন। উলুবেড়িয়া মহিলা থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর সোনম বাগচী উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন এবং সাঁতারে নিজেদের পরিচয় গড়ে তুলে দেশের সুনাম বৃদ্ধির কথা বলেন। ক্রীড়া ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী মণ্ডল সরকার এবং বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার পুরো সময় উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের 'সুস্থ ভারত সমর্থ ভারত' গড়তে খেলাধুলা করে শরীর ও মনের বিকাশের কথা বলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্রীড়া ভারতীর জেলা সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে তুহিনা প্রকাশনীর গ্রন্থ প্রকাশ

গত ৪ সেপ্টেম্বর শ্রীজন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে তুহিনা প্রকাশনী ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'পূজ্যপাদ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের গুণাবলীর সমগ্র রচনাবলী'র সুবৃহৎ দুই খণ্ডের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান। যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের— ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ-স্থিত সদর কার্যালয়ের 'রাজা শ্রীনাথ' সভাগৃহে উপরোক্ত অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স দপ্তর, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। প্রথমে পূজনীয় মহারাজ ও বিশিষ্ট অতিথিদের করকমলে উমাশঙ্কর সম্পাদিত 'পূজ্যপাদ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের গুণাবলীর সমগ্র রচনাবলী' গ্রন্থটির আবরণ উন্মোচিত হয়। গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা হলেন স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। এরপর স্বরূপকুমার ধবল রচিত 'বন্দে মাতরম্ ও নেপথ্য ইতিহাস', অস্মিতা চক্রবর্তী সম্পাদিত 'হরিৎ-কল্যাণ কথা', বেবী কারফরমা অনূদিত (মূল লেখক— মনোজ বোরগাওকর) 'নদীষ্ট', ড. অনুপম যশ রচিত 'সন্ত গুরু রবিদাসের জীবন ও দর্শনচিন্তা' ও 'লোকমাতা অহল্যাবাঈ হোলকর' প্রভৃতি পুস্তকসমূহের আবরণ উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ ও মাননীয় মন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

LIVE THE UNCROWDED LIFE

JUST 30 PRESIDENTIAL HOMES

ahana is boutique living at its finest — a rare opportunity to own an exceptional
esidence in a highly private, exclusive condominium.

, 4.5 & DUPLEX | 1 MIN FROM ACROPOLIS MALL | 5.03 CR* ONWARDS

KNOW MORE

WBRERA/P/KOL/2026/004104 | rera.wb.gov.in | nørtex

98830 55000

primarcaahana.in

PRIMARC AAHANA

মধ্য কলকাতায় বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী ও বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন

গত ১২ আগস্ট মধ্য কলকাতায় বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও নবীন চাঁদ বড়াল লেনের সংযোগস্থলে, কলকাতা পুরসভার ৪৮ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী ও বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর ভ্রাতুষ্প্রপৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত, বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস, বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শান্তনু মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের কন্যা ড. পূরবী সেন, বিপ্লবী ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর কন্যা মিঠু চক্রবর্তী, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের ভ্রাতুষ্পৌত্রী রমা রায়, বিপ্লবী দেবকুমার ঘোষের কন্যা মিতালী সরকার, বিপ্লবী নিরঞ্জন চক্রবর্তীর কন্যা দীপশিখা চৌধুরী ও বিপ্লবী বিশ্বনাথ মল্লিকের কন্যা কৃষ্ণা সাহা। এদিন বিপ্লবী পরিবারগুলির প্রতিনিধিদের বিশেষভাবে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা-স্বরূপ শাল ও উত্তরীয় পরিয়ে, পুষ্পস্তবক, মিষ্টির হাঁড়ি ও ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে মহান বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ইতিহাসগাথা স্মরণ করে এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে সমাজের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরণের আহ্বান জানানো হয়। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশ্বরূপ দে।

দক্ষিণ দমদমে 'কালিয়াদহ নগর'-এর যুব সম্মেলন

গত ৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ দমদম-স্থিত রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাংগঠনিক কলকাতা মহানগরের উত্তর-পূর্ব ভাগের কালিয়াদহ নগরের 'যুব সম্মেলন'। এদিনের যুব সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভাগ সঙ্ঘচালক রামকৃষ্ণ পাল, আদ্যাপীঠ (দক্ষিণেশ্বর)-এর সন্ন্যাসী পূজনীয় তেজস্বানন্দজী মহারাজ ও রামকৃষ্ণ মঠের সন্ত পূজনীয় শ্রী প্রতীক মহারাজ। প্রারম্ভিক ভাষণ দান করেন সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর পূর্ব বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী। এরপর সম্মেলনে উপস্থিত যুবসমাজের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন তেজস্বানন্দজী মহারাজ ও শ্রী প্রতীক মহারাজ। 'যুবশক্তিই রাষ্ট্রশক্তি'— এই বিষয়টি তুলে ধরে তাঁরা বলেন যে, সংগঠনই হলো যুবসমাজের শক্তির উৎস। সেবা-ই হলো যুবসমাজের ধর্ম এবং সংস্কৃতি রক্ষা হলো যুবসমাজের দায়িত্ব। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বিভাগ প্রচারক ডাঃ পলাশ দলুই। এরপর কেরিয়ার গাইড হিসেবে জিআরসি (গভর্ন্যান্স, রিস্ক অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) কনসালট্যান্ট সুদীপ ঘোষ ও ইনফর্মেশন সিকিউরিটি প্রশিক্ষক জয়দীপ ব্রহ্মচারী সম্মেলনে উপস্থিত যুবসমাজের সামনে পাওয়ার-পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন সাইবার-সিকিউরিটি-র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক যুগে মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হয়ে উঠেছে 'ইন্টারনেট'। এর সঙ্গে হ্যাকার ও বিভিন্ন রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির কার্যকলাপের কারণে দেশজুড়ে বেড়ে উঠেছে হ্যাকিং, অনলাইন প্রতারণা ও সাইবার ফ্রড। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ব্যক্তিগত ডেটা বা তথ্য নানাভাবে হয়ে উঠছে অসুরক্ষিত। এই কারণে ডেটা প্রোটেকশন অফিসার বা জিআরসি কনসালট্যান্ট-এর মতো বিভিন্ন চাকুরি বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করেছে। সাইবার সুরক্ষা, এথিকাল হ্যাকিং, এন্ড-পয়েন্ট প্যাচ ম্যানেজমেন্ট-সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যুবসমাজের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলি যুবকদের সামনে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট কেরিয়ার গাইড সুদীপ ঘোষ ও জয়দীপ ব্রহ্মচারী।

ফঃ ৪

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠক

গত ২২ আগস্ট শিলিগুড়ির শ্রীশ্রীরাধামাধব মন্দির (ইসকন) প্রাঙ্গণে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত মার্গদর্শক মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সম্পন্ন হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সাধুসন্ত ও ধর্মাচার্যদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটে। বৈদিক ঐতিহ্য অনুযায়ী মাঙ্গলিক ভজন-কীর্তনের মাধ্যমে বৈঠকের শুভ সূচনা হয়। শুভ্র বসন পরিহিতা গুরুকুলের ছাত্রীদের কণ্ঠে ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। বৈঠকে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ-সহ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বরিষ্ঠ কার্যকর্তাগণ।

বৈঠকে সনাতন সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরাকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সনাতন মূল্যবোধে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন, গ্রামীণ অর্থনীতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় গোশালা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও গোসেবার বিস্তার এবং প্রতিটি প্রত্যন্ত গ্রামে সৎসঙ্গ সপ্তাহের মাধ্যমে ব্যাপক ধর্মজাগরণ অভিযান পরিচালনা করা। উপস্থিত সাধুসন্তগণ স্পষ্ট বার্তা দেন যে, জাতীয় মূল্যবোধ ও মানবিক অবক্ষয় রোধে আধ্যাত্মিকতার প্রচারই একমাত্র পথ। সভায় আগামী কর্মসূচি প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে, প্রয়াত অশোক সিংহলজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে একটি ঐতিহাসিক ও সুবিশাল সন্ত সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এছাড়াও সন্ত রবিদাসজীর ৬৫০ তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমীকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে বিশ্বজুড়ে মহাসমারোহে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাবেশে উপস্থিত সন্ত সমাজ সনাতন সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা এবং সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধারাবাহিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং আগামী প্রতিটি পদক্ষেপে সক্রিয় ও সর্বাত্মক সহযোগিতার দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করেন।

ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের উদ্যোগে মালদায় রাখিবন্ধন উৎসব

সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা দিতে এক ব্যতিক্রমী রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন করে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের মালদা জেলা শাখা। এদিন মালদা শহরের অতুল মার্কেট সংলগ্ন আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দেন ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের কার্যকর্তারা। রাখি পরানোর পাশাপাশি ছোটোদের হাতে চকোলেট ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংযোজক অমরচন্দ্র কর্মকার, প্রান্তের কার্যকরী সদস্য দেবব্রত মিশ্র, জেলা সমিতির পক্ষ থেকে প্রগতিকান্তি বিশ্বাস, বাসবী কর্মকার, তাপসী মণ্ডল, রণজিৎ ব্যানার্জী প্রমুখ। সংগঠনের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

হাওড়া জেলা জুড়ে ক্রীড়া ভারতীর 'খেল দিবস' উদ্‌যাপন

গত ২৯ আগস্ট হকির কিংবদন্তী খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে হাওড়া জেলাজুড়ে বিভিন্ন ক্রীড়ামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে 'খেল দিবস' পালন করে হাওড়া জেলা ক্রীড়া ভারতী। এই উপলক্ষ্যে জেলার ৭টি ব্লকে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা ও আত্মরক্ষামূলক কর্মসূচির অয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি সুস্থ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের বার্তা দেওয়া হয়। বাগনানে চার দলীয় পুরুষ এবং দুই দলীয় মহিলা দলের কবাডি, উদয়নারায়ণপুরে চার দলীয় ফুটবল, শ্যামপুরে খো খো ও কবাডি প্রতিযোগিতা এবং উলুবেড়িয়ায় আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন এবং মেজর ধ্যানচাঁদের জীবনী ও 'খেল দিবস' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া ভারতীর বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার, জেলা সম্পাদক সুরজিৎ মান্না এবং শ্যামপুর কলেজের অধ্যাপক তাপস প্রামাণিক, জাতীয় কবাডি খেলোয়াড় মনীষা মেটে, অমিত সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের জাতীয় খেলোয়াড় সুনয় মাঝি, তন্ময় প্রামাণিক।

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে বাঁকুড়ার হাড়জোড় গ্রামে রাখিবন্ধন উৎসব

গত ৩০ আগস্ট দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সদস্যরা বাঁকুড়া জেলার ছাতনার হাড়জোড় গ্রামের দরিদ্র মানুষদের হাতে রাখি বেঁধে উৎসব পালন করেন। রাখি বাঁধার পাশাপাশি গ্রামের ৬০ জন ছেলে-মেয়ের হাতে খাতা, কলম ও বিস্কুটের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মা-বোনেরাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যতম ট্রাস্টি তথা গ্রামবাসী অসীমলাল মুখার্জী, সৈকত গাঙ্গুলী ও দেব ঘোষাল।

শ্রদ্ধার ১৮৬ তম শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা গত ৩০ আগস্ট সিউড়ী থানার কড়িধ্যা কালিপুর গ্রামের ৮১ বছর বয়স্ক সুকুমার দাসকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ওঙ্কার ধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন সংস্থার সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সংস্থার প্রবীণ অনুভবী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী অসীমা মুখোপাধ্যায়। শ্রীদাসকে পূজা করেন তাঁর তিন কন্যা। মাল্যভূষিত করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন প্রবীণ অনুভবী আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। সংস্থার তাৎপর্য ও লক্ষ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সংগঠক ও সমাজসেবী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। উত্তরীয় পরিয়ে গীতা, বস্ত্র, ফল ও মিষ্টি নিবেদন করেন অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, দামোদর ঘোষাল, সৌমেন সিংহ চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ দাস। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখার্জী, সুজাতা বিষ্ণু। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। অনুষ্ঠান সুচারুরূপে উপস্থাপনা ও সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী তথা যাত্রাভিনেতা মিলন চট্টোপাধ্যায়। শান্তিমন্ত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সৌহার্দ্যের বার্তা নিয়ে বহরমপুরে রাখিবন্ধন

গত ২৮ আগস্ট দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ রাখিবন্ধন উৎসব। এদিন শহরের গোরাবাজার মোহন সিনেমা মোড় সংলগ্ন শ্রীদক্ষিণা কালী ও হনুমান মন্দিরের সামনে তিন ঘণ্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। রাখিবন্ধনের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সোমদীপ মজুমদার, ডঃ রতন ঘোষ এবং শিক্ষক প্রদীপ রায়। পথচারী মানুষ থেকে শুরু করে টোটোচালক ও যাত্রী, ছাত্র, পুলিশকর্মী -সহ দেড়হাজার মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দেন সংগঠনের সদস্যরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিদ্ধার্থ আচার্য।

বেহালার 'নব প্রয়াস' বিশেষ বিদ্যালয়ে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান

রাখিবন্ধনের পুণ্যতিথিতে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের মুখে হাসি ও আনন্দ প্রদানের উদ্দেশ্যে বেহালা বুড়ো শিবতলা নগরের উদ্যোগে এর অভিনব কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে বেহালার 'নব প্রয়াস' বিশেষ বিদ্যালয়ের ১০০ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের হাতে রাখি পরিয়ে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়ন করা হয়।

Today's Choice.....
Vandana®
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidery
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা লোকসাহিত্যে বিশাই

নন্দলাল ভট্টাচার্য

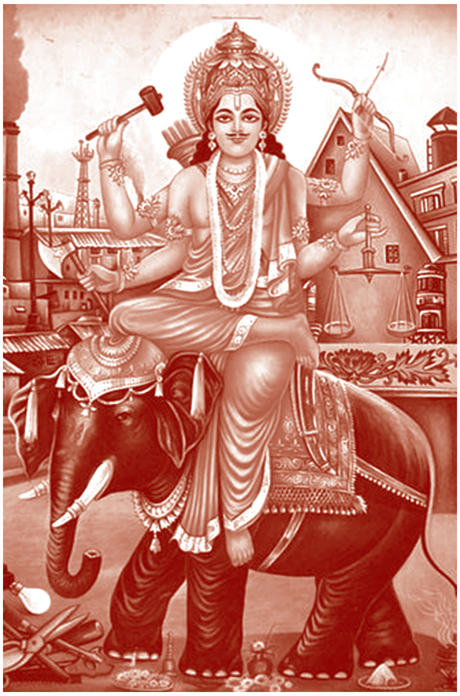

বিবর্তন :

বেদের দেবতা ত্বষ্টা। সৃষ্টিতে তাঁর অধিকার। পুরাণে তিনি বিশ্বকর্মা— দেবশিল্পী। লৌকিকে তিনিই ঘরের ছেলে বিশাই— শ্রমজীবীদের অধিদেবতা— অধিনায়ক। বিবর্তনের এই ধারায় একসময় তিনি ছিলেন সৃষ্টিকর্তার প্রতিরূপ। উত্তর ভারতে বিশ্বকর্মা তাই বৃদ্ধ-শান্ত-শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত-হংসবাহন। বঙ্গদেশ-সহ পূর্বভারতে তিনি তরুণ-যুবা— শ্মশ্রুবিহীন ও সূক্ষ্ম গোঁফে— যেন দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র প্রতিমূর্তি। বাহন তাঁর হাতি। অতিকায় মহাশক্তির প্রতীক বিশ্বকর্মাকে বহনের যোগ্য তাই হাতি ছাড়া প্রাণীকূলে বিকল্প কেউ নেই বঙ্গীয় মননে।

লোকসাহিত্যে বিশ্বকর্মা কোনো দূর অমরার অধিবাসী নন, নন কোনো অপার্থিক জ্যোতির্ময়— তেজোময়— ভয়ের কোনো দেবতা। বরং তিনি হলেন শ্রমজীবী মানুষের অত্যন্ত কাছের একজন —প্রতিদিনের জীবনের প্রতিটি কাজের সহায়ক এবং সবরকম যান্ত্রিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগানদার। তিনি একজন কুশলী শিল্পী— কারিগর— দক্ষ যন্ত্রবিদ। লৌকিক সংস্কৃতির তিনি এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থ ও পুরাণে বিশ্বকর্মা হলেন দেবলোকের সর্ববিদ্যা বিশারদ স্থপতি ও ভাস্কর। দেবতাদের সবরকম প্রতিরক্ষা সামগ্রী অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও রথ ইত্যাদি যানের নির্মাতা। দেবতাদের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি প্রয়োজন মেটানোর পরও তাঁর স্থান যেন প্রধান দেবতাদের পেছনের পঙ্ক্তিতে। কিন্তু লোকমানসে— লোকসাহিত্যে তিনি সাধারণ মানুষের একান্তই আপনজন। সবরকম সুখ-দুঃখের সঙ্গী। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজের সহায়ক তিনি। তাই তাঁর পূজায় আছে ঘরের মানুষকে এক করে কাছে টেনে বরণ করার মানসিকতা। ভয়ে ভক্তিতে— অতি সম্ভ্রমে অঞ্জলি দেওয়া নয়, আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসায় আপ্যায়িত করার সানন্দচিন্তন সক্রিয় এখানে।

লোক সাহিত্যে :

পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যে বিশ্বকর্মার অবস্থান পরিবারেরই একজন হিসেবে। কামার, কুমোর, ছুতোর, শাঁখারি, কাঁসারি, তাঁতি বা রাজমিস্ত্রি-সহ সমস্ত খেটেখাওয়া মানুষের তিনি আরাধ্য দেবতা। লোকবিশ্বাসে তিনি কোনো বিমূর্ত অলৌকিক শক্তি নন। তিনি রক্তমাংসের মানুষের মতোই অতি পারদর্শী একজন যন্ত্রবিদ ও শিল্পী। তাঁর কৃপা দৃষ্টিতেই সম্ভব যে কোনো নির্মাণশৈলীর সার্থক রূপায়ণ।

পশ্চিমবঙ্গের তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, মানুষের কল্যাণে মানবসভ্যতার অন্যতম দান তাঁতযন্ত্রের আবিষ্কারক স্বয়ং বিশ্বকর্মা। আবার কামারশালার হাতুড়ি-নেহাই বা হাপরের মধ্যেও বিশ্বকর্মারই সৃজনী শক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করেন কর্মকার সম্প্রদায়। একইভাবে কুমোরের চাকা, শাঁখারির করাত বা স্বর্ণশিল্পীর হাতের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির মধ্যেও বিশ্বকর্মারই অবস্থান অনুভব করেন ওইসব সৃজন-কর্মের শিল্পীরা।

বিশ্বকর্মার প্রতি নির্ভরতা ও ভালোবাসার কথাই ব্যক্ত হয় বঙ্গের লোকগীতি, বিশেষ করে ভাদু, টুসু বা বিভিন্ন রকম পেশাভিত্তিক শ্রম-সঙ্গীতে। পল্লিবধূরা আপন মনের মাধুরীতে ছড়া কাটেন বিশ্বকর্মাকে স্বাগত জানিয়ে, সেসব ছড়ায় থাকে এক ধরনের সারল্য। কোনো চেষ্টিত প্রয়াসে বৈদগ্ধ্য প্রকাশের বাসনায় নয়, অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসার ভূমি থেকে উৎসারিত ওই সব ছড়ার সাবলীলতায় অবশ্যই হতে হয় বিমুগ্ধ। তেমনই এক গ্রামীণ ছড়া,—

বিশ্বকর্মা ঘুড়ি ওড়ায়,
ভাদর মাসের শেষে,
কারিগরের ঘরে ঘরে
আনন্দ আজ আসে।

কেবল কৃষক-কামার-কুমোর ঘরের বধূদের স্বতঃস্ফূর্ত গানে নয়, আধুনিক যুগে যিনি বাস অথবা লরি চালান, যিনি রিকশা টানেন বা ওই রকম নানা যানবাহন চালান— তিনিও বিশ্বকর্মার করুণার কথা স্মরণ করেন

অনুক্ষণ। তাই এই আধুনিককালেও তাদেরই কেউ কেউ রচনা করেন একই ভাবে বিশ্বকর্মার বন্দনা গান কোনো এক আনন্দঘন মুহূর্তে। তেমন একটি গান,—

দয়াল বাবা বিশ্বকর্মা
এসো আমার গাড়িতে—
তোমার দয়ায় চাকা ঘোরে
তেল লাগে না বাড়িতে।

বিশেষ করে লৌকিক জীবনে বিশ্বকর্মা পূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঘুড়ি ওড়ানো এবং ঘুড়ি কাটার অনুসঙ্গটি। লোকসাহিত্যের নানা কাহিনিতে ঘুড়িকে মনে করা হয় বিশ্বকর্মার কৃপার প্রতীক। কর্মক্ষেত্রের সীমাহীন বিস্তৃতিরই রূপক যেন আকাশ। ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্য দিয়ে যেন অনুভূত হয় আকাশ-পায়ের দিব্যলোকের স্পর্শের সুখানুভূতি। ঘুড়ির লড়াই যেন শিল্পের দেবতার নানা কুশলী ক্রিয়ার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার, পরিচিত হওয়ার এক একটি শুভ মুহূর্ত। লড়াই ও ঘুড়ি কাটার মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে সেই লৌকিক অনুভব ও আনন্দেরই প্রকাশ।

মঙ্গলকাব্যে :

মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিশ্বকর্মা এসেছেন নানা রূপে। নানা কর্ম সম্পাদনের জন্য। এসব ক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা তাঁর মধ্যে কোনো ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটাননি। বরং পারিপার্শ্বিক জীবনের নানা চরিত্রের সহজ সরল রূপটিরই সম্মান পাওয়া যায় বিশ্বকর্মার সেইসব ভূমিকায়।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রধান চরিত্র ছাড়া যে দেবতার সবচেয়ে বেশি আবির্ভাব ঘটেছে, তিনি হলেন বিশ্বকর্মা। তিনি এসেছেন নানা রূপে।

মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান দেবতা শিব, চণ্ডী বা মনসার ইচ্ছাপূরণের জন্য একাধিকবার বিশ্বকর্মা চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো জায়গাতেই তেজসম্পন্ন কোনো দেবতা নয়, তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে ওইসব দেব বা দেবীর আজ্ঞাবহ সেবক হিসেবে। একজন দক্ষ কারিগর হিসেবে, তাঁদের কথামতো ঘর-বাড়ি বা অন্য কিছু তৈরি করে দিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলকাব্যে বিশ্বকর্মার ওইসব ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিকজীবন এবং কুটির শিল্প, বয়ন শিল্প ও স্থাপত্যরীতির একটা বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায়

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল অথবা ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্যে বিশ্বকর্মাকে পাওয়া যায় একজন পারদর্শী স্থপতি হিসেবে।

চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীর আদেশে বিশ্বকর্মা রাতারাতি কালকেতুর জন্য গুজরাট নগরী এবং রাজসৌধ তৈরি করে দেন। একই ভাবে ধনপতি সদাগরের প্রথম স্ত্রী লহনার জন্য ঘর তৈরি এবং পরে সিংহল রাজের প্রাসাদ এবং দুর্গের সংস্কারও করেন বিশ্বকর্মাই।

ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্যেও রয়েছে বিশ্বকর্মার কথা। দেবী অন্নপূর্ণার মহিমা প্রকাশ এবং দেবীর মন্দির ও রাজকীয় ভবন নির্মাণে বিশ্বকর্মার অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে।

'মনসামঙ্গল' কাব্যে বিশ্বকর্মাকে দেখা যায় লখিন্দরের লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করতে। লোহা দিয়ে এক অপূর্ব বাড়ি তৈরি করেন বিশ্বকর্মা। মনসা দেবীর আদেশে বিশ্বকর্মা লোহার সেই বাসরঘরে একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র রাখতে বাধ্য হন।

'শিবায়ণ' কাব্যে আবার বিশ্বকর্মাকে দেখা যায় দুই রূপে। এক রূপে স্থপতি হিসেবে তিনি শিবের বিয়ের ঘর তৈরি করে দেন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে পল্লিবাঙ্গলায় ঘর ছাইবার জন্য যেভাবে ঘরামিকে ডাকা হয়, বিশ্বকর্মাকেও ডাকা হয়েছিল সে ভাবেই। বিশ্বকর্মাও এই নরলোকের একজন সাধারণ ঘরামির মতোই দরদাম করে তারপর ঘর তৈরিতে হাত দেন। নির্মাণ করেন এক অপরূপ বাড়ি।

'শিবায়ণ' কাব্যেই বিশ্বকর্মাকে আর একবার দেখা যায় একজন সীবন শিল্পী বা দর্জি হিসেবে। ঘটনাক্রমে পার্বতী বা দেবী চণ্ডী একবার শিবের কাছে একটি সুন্দর কাঁচুলি বা বক্ষবন্ধনীর জন্য আবদার করেন। স্ত্রীর আবদার মেটাতে শিব নিজেই কাঁচুলি তৈরির কাজে হাত দেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ঠিক ঠিক একটি কাঁচুলি তৈরি করতে পারেন না। বহু চেষ্টার পরও ব্যর্থ হয়ে তিনি শেষে বিশ্বকর্মার শরণ নেন।

গরিব শিবের ডাকে সাড়া দিয়ে বিশ্বকর্মা আসেন মর্ত্যের একজন সাধারণ দর্জির মতো। তারপর সেই মতো তৈরি করেন অসাধারণ কারুকার্যে ভরা একটি কাঁচুলি। সেই কাঁচুলিতে অপরূপা হয়ে ওঠেন পার্বতী বা চণ্ডী। ওইরকম একটি সুন্দর কাঁচুলি তৈরি করে দেওয়ার জন্য তিনি খুশি হন বিশ্বকর্মার ওপর। দেন তাঁকে উপযুক্ত বর।

এই ভাবে দেখা যায়, এই মরভূমে বিশ্বকর্মা হয়ে ওঠেন শ্রমের মর্যাদার প্রতীক। তিনি একজন হস্তশিল্পীর দক্ষতা, শ্রম ও সৃষ্টির আনন্দকে এক অপার্থিব দেবত্বে রূপ দেন।

রূপ ও অর্চনা :

পুরাণ মতে হয় বিশ্বকর্মার পূজা। পূজা হয় ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে। বিশ্বকর্মা চতুর্ভুজ। বাহন তাঁর হাতি। যন্ত্রের দেবতা বিশ্বকর্মার হাতে থাকে হাতুড়ি ও দাড়িপাল্লা। ছেনি, কমণ্ডলু বা বই থাকে অন্য দুই হাতে। বিশ্বকর্মার হাতের দাড়িপাল্লা হলো জ্ঞান ও কর্মের প্রতীক। অন্যদিকে হাতুড়ি হলো শিল্পনির্মাণের প্রতীক।

পুরাণ মতে, অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাস বিশ্বকর্মার বাবা আর মা হলেন বৃহস্পতির বোন যোগসিদ্ধা বা আঙ্গিরসী। বিশ্বকর্মার সন্তান সংখ্যা দশ। অবশ্য কোনো কোনো পুরাণে সংখ্যাটা ১৪। এর মধ্যে পাঁচজন ছেলের বংশধররাই হলেন কামার, স্বর্ণকার, ভাস্কর, ছুঁতোর ও কাঁসারি বা পিতলের কারিগররা। অবশ্য

তন্তুবায়, স্থপতি, রাজমিস্ত্রি, চিত্রশিল্পী, মালাকারাও বিশ্বকর্মার পুত্রদের উত্তরপুরুষ বলে কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়।

পৌরাণিক ধারাতেই বিশ্বকর্মার পূজা হয় মূলত কলকারখানা বা কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বকর্মার সর্বজনীন পূজার যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। মূলত যন্ত্রপাতি বা কলকবজার সঙ্গে যুক্ত পেশার মানুষরাই এই পূজা করে থাকেন। অবশ্য কোনো কোনো গৃহস্থ বাড়িতেও বিশ্বকর্মা পূজা এবং অরন্ধন ব্রত পালন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক জীবনে বিশ্বকর্মার রয়েছে বিশেষ প্রভাব। পূজা ছাড়াও এখনো বঙ্গের বহু মহিলা বিশ্বকর্মার ব্রত করেন। সাধারণত স্নান করে বিশ্বকর্মার ঘট পেতে এবং বাড়ির দেওয়ালে বসুধারা দিয়ে এই ব্রত পালন করা হয়। ঘট প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বকর্মা ব্রতকথা পড়া হয়। অবশ্য এটি একটি মৌখিক ধারা।

ব্রতকথা :

বিভিন্ন কারণেই বিশ্বকর্মার ব্রতকথাটির কাহিনি অত্যন্ত সহজ সরল পথে এগিয়েছে। ঘটনার ঘনঘটা প্রায় নেই বললেই চলে। ব্রতকথার কাহিনিটি আবর্তিত হয়েছে একটি সদাগর পরিবারকে কেন্দ্র করে। কাহিনির অন্যতম চরিত্র এক জোড়া পাখি। কাহিনির শেষে বিশ্বকর্মার মাহাত্ম্যের কথা কীর্তিত হয়েছে। বলা হয়েছে, বহুগুণের অধিকারী বিশ্বকর্মা সবসময় তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন।

কাহিনির সারকথা, ধনপতি নামে এক সদাগর বাণিজ্যে গিয়ে প্রভূত ধনের অধিকারী হন। একবার বাণিজ্যতরী নিয়ে ফেরার পথে দূরে এক তালগাছের দিকে তাঁর নজর পড়ে। মনে হয় তালগাছের মাথায় কে যেন বসে আছে। কৌতূহলী সদাগর নৌকা থেকে নেমে সেই তালগাছের কাছে যান। দেখেন, তালগাছের মাথায় রয়েছে পরমাসুন্দরী এক কন্যা। তার মাথার চুল নেমে এসেছে একবারে মাটিতে।

বিস্মিত ধনপতি বলেন, কে তুমি কন্যা? কেনই-বা রয়েছ ওই তালগাছের মাথায়? প্রশ্নটা শুনেই মেয়েটা একবারে কেঁদে সারা। বলে তার দুঃখের কথা। তার বাবা অতি গরিব। অতি কষ্টে চলে সংসার। বছর বছর হতো তার মেয়ে। গরিব মানুষটি শেষে তার বউকে বলেন, আবার যদি মেয়ে হয় তাহলে তাকে ভাসিয়ে দেবো নদীতে। মন্দ কপাল। আবার হলো মেয়ে। বাবা তাঁর একটি ভেলায় করে ভাসিয়ে দেয় সে মেয়েকে।

নদীর পাড়ে এক তালগাছে থাকত একটা চিল আর তার বউ চিলানি। জলে ভাসাতে থাকা মেয়েটিকে দেখে মায়া হয় তাদের। ভেলা থেকে মেয়েটিকে তুলে তারা এল এই তালগাছে। মানুষ করে তারাই। চৌষট্টি কলায় শিক্ষিত করে তোলে তাকে। সেই মেয়েই সে।

মেয়েটিকে পছন্দ হয় ধনপতির। ঠিক করেন, এরই সঙ্গে বিয়ে দেবেন তার ছেলের। সিদ্ধান্ত মতোই মেয়েটিকে। নিয়ে এলেন বাড়িতে। বিয়ে দিলেন ছেলের সঙ্গে ধুমধাম করে।

নতুন বউকে ভালোবাসে সকলে। আর তাতেই তেলে-বেগুনে জ্বলতে থাকে সদাগরের অন্য ছেলেদের বউরা। চক্রান্ত করে তারা। একদিন নিমন্ত্রণ করে তারা সব আত্মীয় স্বজনকে। আর রান্নার ভার দিল নতুন বউকে।

বউ পড়ল আতান্তরে। সে তো রান্নার কিছুই জানে না। এবার তাহলে কী হবে? নতুন বউ ভাবে। কাঁদে কিছুক্ষণ, তারপর জানালার ধারে গিয়ে একটা সুতো ধরে মারে টান। সুতোটা বাঁধা ছিল সেই তালগাছের সঙ্গে। সুতোয় টান পড়তেই চিল আর চিলানি বোঝে, মেয়ে তাদের ডাকছে। তাই কোনো দেরি না করেই চলে আসে তারা ওই জানালার কাছে। সব শুনে চিলানি বলে, ভয় নেই বাছা। এক কাজ করো। উনুন পেতে বসাও রান্নার পাত্র। তারপর একমনে ভাবো বিশ্বকর্মাকে। তিনিই উতরে দেবেন তোমাকে।

কথামতো কাজ করে নতুন বউ। আর মুহূর্তে রান্না হয়ে যায় নানা উপাদেয় পদ। খেয়ে ধন্যি ধন্যি করে সকলে, আর তাতে হিংসার উনুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে সদাগরের অন্য ছেলেদের বউদের বুকে। তালে তালে থাকে তারা। একদিন দেখে, জানালার সুতো টানতেই এলো এক চিলানি। তার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে নতুন বউ অনেকক্ষণ ধরে।

সব দেখে হিংসুটে বউরা পরদিনই জানালায় বাঁধা সুতো ধরে মারে টান। আর তাতেই সেই চিল আর চিলানি চলে আসে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে বউরা পাখি দুটোকে ধরে কেটেকুটে সেই মাংস রান্না করে খেতে দেয় নতুন বউকে। আর চিল-চিলানির পালক হাড়গোড় পুঁতে রাখে বাড়ির এক কোণে।

নতুন বউ খেতে গিয়েই তাতে গন্ধ পায় সেই চিল আর চিলানির। তাই না খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। সেই রাতে স্বপ্নে দেখা দেয় সেই চিল আর চিলানি। জানায় সব কথা। বলে, তুই স্নান করে বিশ্বকর্মার ঘট পেতে প্রার্থনা জানাস তাঁর কাছে। তারপর ঘটের জল ছিটিয়ে দিবি আমাদের হাড়গোড়ের ওপর। ঘুম থেকে উঠে বউটি তাই করে। ঘটের জলের ছোঁয়ায় বেঁচে ওঠে চিল ও চিলানি। উড়ে যাবার আগে মেয়েকে তারা বলে, আর সুতো ধরে টানার দরকার নেই। এবার থেকে তোর মনের সব কথা জানাবি বিশ্বকর্মার কাছে, তাহলেই হবে সব সমস্যার সমাধান।

তাই করে সেই কন্যা। বিশ্বকর্মার কৃপায় আর কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে না তার। আর তারপর থেকেই পৃথিবীতে প্রচলিত হয় বিশ্বকর্মার ব্রত।

বঙ্গের মেয়েরা আজও পালন করেন এই ব্রত বিশ্বকর্মার কৃপা লাভের আশায়। □

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও ঘুড়ির জন্ম ইতিহাস

ডঃ সর্বাণী চক্রবর্তী

বিশ্বকর্মা হলেন 'উচ্চ কোটির' দেবতা। কারণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মতো এই দেবতা হলেন সৃষ্টিকর্তা। তিনি নিজে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র। মনুষ্য সমাজে যতরকম শিল্পী সম্প্রদায় যেমন— শঙ্খকার, মালাকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার, চিত্রকর ইত্যাদি সবই তাঁর সন্তান। সেজন্য দেখতে পাই বিশ্বকর্মাকে আদি দেবতা জ্ঞানে সকল শিল্পীগোষ্ঠী আরাধ্য দেবতা হিসেবে পূজা করে আসছেন।

তিনি যে শুধু সৃষ্টিকর্তা তাই নন, তিনি একাধারে মহাবীর, অষ্টগুণ যুক্ত বর্মধারী মহাযোদ্ধাও বটে। এই মহাশিল্পী চারিত্রিক সৌন্দর্যেও মুগ্ধকর। তিনি সর্ব অভীষ্ট প্রদানকারী, কারুকার্য সাধক। ঋগ্বেদে প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়েছে—

'দেবশিল্পী মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসাধক।

বিশ্বকর্ম্মান্নমস্তুভ্যং সর্বাভীষ্টপ্রদায়ক।'

আবার তিনি 'পরম' বা সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বিশ্বযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেন— তাই তিনি বিশ্বকর্মা।

পুরাণে বলা হয়েছে বিশ্বকর্মার জন্ম ব্রহ্মার নাভিকমল থেকে। আবার কারও মতে বিশ্বকর্মা অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের ঔরসে বৃহস্পতির বোন বরবর্গিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাহলে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্মা কি এক না ভিন্ন? আসলে ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্মা হলেন সৃষ্টির দুটি দিকের জাগতিক প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ মতে তিনি দেবতাদের অস্ত্র ও বিমান নির্মাণ করেছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা রথের উল্লেখ পাই তাও বিশ্বকর্মারই সৃষ্টি। এছাড়া কুবেরের অলকাপুরী, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী যা দেবরাজ ইন্দ্রেরও ঈর্ষার কারণ হয়েছিল রাবণের স্বর্ণলঙ্কা তাঁর অসামান্য বাস্তুবিদ্যাজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তাঁর ভাস্কর্যজ্ঞান ও সৌন্দর্যজ্ঞানের তুলনা নেই। এছাড়া অসামান্য তিলোত্তমার সৃষ্টি যার সহায়তায় দেবতাদের শত্রু সুন্দ উপসুন্দ অসুর দুটিকে বধ করা সম্ভব হয়েছিল। মহামুনি অগস্ত্যের জন্য তৈরি করেন কুঞ্জরপর্বতে অগস্ত্যভবন।

শুধুমাত্র প্রাসাদ তৈরি নয়, শ্রীরামচন্দ্রের সেতু বন্ধনেও সবরকম সাহায্য করেছিলেন সেনাপতি নলের কাজে। এছাড়া বৃত্রাসুর বধের জন্য নৈমিষারণ্যে ধ্যানরত মহামুনি দধীচি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলে তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা যে বজ্র তৈরি করেন তা দিয়েই বৃত্রাসুরকে সংহার করা হয়। শ্রীচণ্ডীতে আছে মহামায়াকে যে কবচকুণ্ডল দান করেন তাও বিশ্বকর্মারই তৈরি— যা দিয়ে মহিষাসুর নিধনে সমস্ত বাধা দূর হয়েছিল। এমনকী শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্র বিশ্বকর্মারই শিল্প অবদান।

যিনি দেবতাদের বিমান তৈরি করেছেন, দেবতাদের স্বর্গীয় রথও তাঁরই অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি। তাহলে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বকর্মার সঙ্গে বিমানের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তাহলে দেখা যায়— বিমানেরই কারিগরি রূপ হলো ঘুড়ি। আবার 'বিশ্বকা' শব্দের অর্থ হলো 'চিল'। সেই চিলেরই এক সংস্করণ হচ্ছে ঘুড়ি। আবার দেখি হিন্দুদের উৎসবের শুরু হয় শরৎকালে বিশ্বকর্মা পূজা দিয়ে, আবার শেষ হয় মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা দিয়ে।

কলকাতায় বিশ্বকর্মা পূজার আগে থেকেই যে ঘুড়ি ওড়ে তা নতুন কথা নয়। বর্তমানে চীনা মাঞ্জায় অনেক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি করা হয়। কাঁকিনাড়া, নৈহাটি, ব্যারাকপুরে ঘুড়ি ওড়ে সরস্বতী পূজার দিন। তাই সেই দিনটিকে বলা হয় 'Kite Day'। এর থেকে বোঝা যায় বিশ্বকর্মা পূজায় ঘুড়ি ওড়ানো শুরু হয় আর শেষ হয় সরস্বতী পূজার দিন।

আবার দেখি শ্রীরামপুরে ঘুড়ি ওড়ে পৌষ সংক্রান্তির দিন এবং নবদ্বীপে রাসযাত্রায়। তবে বিশ্বকর্মা পূজার দিন ঘুড়ির আসর বসার রীতিটি বহু প্রাচীন। সমাচার দর্পণে (১৮২১ সালে) প্রকাশিত হয়েছিল বাবুদের ঘুড়ির আসর নিয়ে ছড়া— 'ঘুড়ি তুড়ী মান দান, আখড়া বুলবুলি মানিয়া গান/অষ্টাহে বনভোজন, এই নবধাবাবুর লক্ষণ।' শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন— 'সেকালের বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলের লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বাজাইয়া কাল কাটাইত।'

সেই সময়ে ঘুড়ির লড়াই হতো— ছাতুবাবু, লাটুবাবু, হাটখোলার মিত্তির ও নবকৃষ্ণদেবের পরিবারবর্গের মধ্যে। ১০০ টাকার নোট জুড়ে জুড়ে তৈরি হতো ঘুড়ির বিরাট ল্যাজ। অনেক সময়ে ঘুড়ির মধ্যে টাকা আটকে তাতে বাবুর নামও লেখা থাকতো। তবে পঞ্চাশ বছর কিংবা কিছু বছর আগে যেভাবে আকাশে ঘুড়ি উড়ত তা আজ আর নেই বললেই চলে। ◻

পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ-বিরোধী আন্দোলন

সুভাষ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ—‘নিখিল বঙ্গ নাগরিক সঙ্ঘ’। এই সংগঠনটি মূলত পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু শরণার্থীদের সংগঠন। ১৯৮১ সালে ডিসেম্বর মাসে এক হাজার প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে কলকাতার রাজাবাজার, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, পাটোয়ার বাগান, বৈঠকখানা রোড, শিয়ালদহ এলাকার মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উপরোক্ত এলাকা দপ্তরি পাড়া (বই বাঁধাই) হিসাবে পরিচিত। বিভিন্ন বই বাঁধাই কারখানায় প্রায় তিন শতাধিক বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী কর্মরত ছিল। এরা বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার, নাগরপুর থানার অন্তর্গত ধুবুরিয়া সলিমাবাদ, গয়হাটা, টেংরিপাড়া, ভাদ্রা, এলাসিন গ্রামের মুসলমান বাসিন্দা। এখানে কাজ করে গোপন পথে বাংলাদেশে নিয়মিত টাকা পাচার করত। মাঝেমধ্যেই এদের লাল ঝান্ডা মিছিল মিটিংয়ে শোভা বর্ধনে দেখা যেত। রাজাবাজার মোড়ে এই প্রতিবেদকের একটি বই বাঁধাই কারখানা ছিল। সেখানে বিখ্যাত যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত পাটীগণিত বই বাঁধাই হতো।

প্রতি রবিবার ছুটির দিনে বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত কারখানা ঘরে নাগরিক সঙ্ঘের এবং প্রতি বৃহস্পতিবার ১৩৬, যোধপুর পার্কে ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হতো। এই সভা থেকেই পরবর্তী কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। সভায় উপস্থিত থাকতেন সঙ্ঘের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, রাণাপ্রতাপ রায়, বেলেঘাটার মানিকরতন দাস, শঙ্কর চক্রবর্তী, প্রবীণ স্বয়ংসেবক বঙ্কিম ঘোষাল, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও লেখক সুনীল গুহ, জ্যোতিষ মজুমদার, শ্যামল সরকার ও এই লেখক। ১৯৪৬ সালে ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’-এর সময় রাজাবাজারে এই বাড়িতে এসেছিলেন গুলজারীলাল নন্দা। বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপক বলরাজ মাধক, গোপাল গডসে, বিক্রম নারায়ণ সাভারকার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা উত্তরবঙ্গের হিন্দু আন্দোলনের নেতা মনমোহন রায়, বিপ্লবী ক্ষিতীশ বসু এই সংগঠনের বিভিন্ন সভা ও বৈঠকে যোগদান করেছেন।

একটি রবিবারের সভায় শ্যামল সরকার ‘অনুপ্রবেশ’ বিষয়টি প্রথম উত্থাপন করেন। সিদ্ধান্ত হয় আগামী দিনে শ্যামলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এর সত্যতা যাচাই করা হবে। শিয়ালদহ-রাজাবাজার অঞ্চলের কুড়িটি কারখানা ঘুরে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই দিনই সন্ধ্যায় সুব্রতবাবুকে ফোনে অবগত করি। তাঁর নির্দেশে একটি প্রচারপত্র লিখে বৃহস্পতিবার সভায় উত্থাপন করি। হেডিং ছিল বাংলাদেশি ‘অনুপ্রবেশকারী মুসলিম তাড়াও’। প্রচারপত্রটি মুদ্রণের জন্য বেশ কয়েকটি প্রেসে গেলে লাল ঝান্ডার ভয়ে তারা অসম্মতি প্রকাশ করেন। শেষপর্যন্ত এপিসি রোডে আমাদের প্রেস মালিক মিঠু বসু রাজি হন। ১ হাজার প্রচারপত্র শ্যামল সরকার, বিমল দাস ও এই প্রতিবেদক— তিন জন মিলে বিলি করতে

শুরু করি। ১৯৮২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের বড় পুত্র অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি এক হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে বলেন এ বিষয়ে একটি সুন্দর পোস্টার প্রিন্ট করে বিভিন্ন প্রাচীরে লাগিয়ে দাও। সেই টাকায় ২ হাজার পোস্টার কাঠের টাইপে মুদ্রিত হয়েছিল। পোস্টারটির বয়ান ছিল— 'লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশে পশ্চিমবঙ্গ ডুবন্ত : রাজনৈতিক নেতারা পার্টিবাজিতে উন্মত্ত! এই সর্বনাশ রুখবে কে?— নিখিল বঙ্গ নাগরিক সঙ্ঘ। সুভাষ চক্রবর্তী ৮৫ এপিসি রোড, কলকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।' ওই প্রেসে পোস্টারটি মুদ্রিত হয়। এই পোস্টারটি শিয়ালদহ এলাকায় প্রথম প্রাচীরে সাঁটতে গেলে লালঝান্ডাওয়ালাদের উত্তমমধ্যমের শিকার হয় সংগঠনের সদস্যরা। এই প্রতিবেদকের পূর্ব পরিচিত কয়েকজন হকার ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়। সহযোগী জয়ন্ত মালিককে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন প্রাচীরে শতাধিক পোস্টার লাগিয়ে ফিরে আসি। হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন স্থানে পোস্টারটি ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে কলকাতার বড়বাজার এলাকার স্বয়ংসেবক বালকৃষ্ণ লুড্ডিয়াজীর হাতে একটি পোস্টার তুলে দিলে তিনি দুই রিম পোস্টার পেপার এই প্রতিবেদকের হাতে তুলে দেন। সেই পেপারে আরও দু'হাজার পোস্টার ছাপা হয়। প্রতি শনিবার নাগরিক সঙ্ঘের সভায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রতি শুক্রবার শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে পথসভায় 'নিখিল বঙ্গ নাগরিক সঙ্ঘ' ব্যানারে অনুপ্রবেশ-বিরোধী প্রচার শুরু হয়। এরপর পঞ্চায়েত নির্বাচনে নদীয়া জেলার চাকদহ-২ জেলা পরিষদ কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে অনুপ্রবেশ বিষয়টি প্রচার করতে শুরু করে এই প্রতিবেদক। নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন নাগরিক সংগঠনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, রাণাপ্রতাপ রায়, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী তাপস চট্টোপাধ্যায়। এরা আর্থিকভাবে সহযোগিতাও করেছিলেন।

চাকদহ, হরিণঘাটা, হাবরা, গাইঘাটা, রাণাঘাট থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় তখন চলছিল জেহাদিদের তাণ্ডব। হিন্দু বাড়িতে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, তোলাবাজি প্রতিদিনের ঘটনা। অপরাধীরা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করত। ভারতে প্রবেশ করে অপরাধ করতো। স্থানীয় কার্যকর্তা রাজেন দাস ও মধু বালাকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘরোয়া সভা চলতে থাকে। বেশ কিছু গ্রামের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করে নিয়ে, চাকদহ থানার রসুল্লাপুর গ্রামে কিশোরী বিশ্বাসের বাড়ির বিরাট চত্বরে হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন নাগরিক সঙ্ঘের কার্যকর্তা পদো সাধু। অতিথি বক্তা ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ডায়মন্ড হারবার শাখার স্বামী অশোকানন্দজী মহারাজ, সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। এই সভার পর এলাকায় হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। ছোট জাগুলিয়া, নগর উখড়া, নীমতলায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দিল্লি শাখার অধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দজী মহারাজ, ব্যারিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিজেন বসু, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, অনিমা বসুকে নিয়ে একাধিক জনসভার মাধ্যমে জনমত গঠনের কাজ চলতে থাকে। একপর্যায়ে ছয় শতাধিক সাইকেল মিছিল সংগঠিত করা হয়। চাকদহ থানার নেতাজী বাজার থেকে চল্লিশ কিমি রাস্তা অতিক্রম করে বনগাঁ মহকুমা শাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এই সময় বনগাঁ এলাকার বিধায়ক ভূপেন শেঠ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিষয়টি জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলে স্মারকলিপির একটি কপি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। রাজ্য বিধানসভায় এ প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন উত্থাপনও করেছিলেন। রাজভবনে নাগরিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছিল। ক্রমশ চাকদহ, হরিণঘাটা এলাকায় আন্দোলনের পক্ষে জনমত সংগঠিত হতে থাকে। পার্শ্ববর্তী গাইঘাটা, হাবরা, রাণাঘাট এলাকার হিন্দুদের মধ্যে এই আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

১৯৮৬ সালে ২৮ জানুয়ারি চাকদহ থানার নেতাজী বাজার স্কুল মাঠে বিরাট জনসভার ডাক দেওয়া হয়। সেখানে প্রচুর মানুষ সমবেত হয়। মাঠ উপচে পাশের কৃষি জমি, দোকানের চালে, গাছের ডালে মানুষ দেখা যায়। সভায় প্রথম বক্তা এই লেখক, পরবর্তী বক্তা শিক্ষিকা শ্রীমতী অনিমা বসু, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, শেষ বক্তা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দিল্লি শাখার অধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দজী মহারাজ। উপরোক্ত জনসভায় সব বক্তাই বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের ডাক দেন। অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়দানকারী লাল ঝান্ডাওয়ালাদের বিবেক জাগ্রত করার আহ্বান জানানো হয়। সভা শেষে কর্মী ও সমর্থকরা পায়ে হেঁটে, সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরতে শুরু করেন। এই সময় উপরোক্ত এলাকায় যানবাহন যোগাযোগ ভালো ছিল না। প্রায় ২ শতাধিক মহিলা, পুরুষের একটি দল পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে রসুল্লাপুর মাদ্রাসার সামনে রাস্তায় ওতপেতে থাকা অনুপ্রবেশকারী জেহাদিদের আক্রমণের শিকার হয়। শীতকালীন সন্ধ্যা তখন কুয়াশার চাদরে ঢাকা। অন্যদিকে বোমা ফাটানোর ধোঁয়ায় এলাকা অন্ধকার হয়ে যায়। বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন নাগরিক সঙ্ঘ কর্মী সুধন্য মল্লিক (৫৫), প্রহ্লাদ ভৌমিক (৩৫)। সুধন্যবাবুর কানের মধ্যে রিভলবারের নল ঢুকিয়ে গুলি চালিয়ে হত্যা করে জেহাদিরা। প্রহ্লাদবাবুকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রায় ৫৫-৬০ জনের সশস্ত্র জেহাদির দল অন্য সংগঠনের কর্মী, সমর্থকদের বেধড়ক মারধর করে। তাদের নিকট থাকা স্বর্ণালঙ্কার, টাকা-পয়সা লুঠ করে নিয়ে চলে যায়। প্রাণ বাঁচাতে নিরস্ত্র কর্মীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা

করে।

পরবর্তী সময়ে গোপন সূত্রে জানতে পারা যায় যে, জেহাদিদের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল এই আন্দোলনের নেতৃত্বকে হত্যা করা। সেই সময় বক্তাদের নিয়ে যে রাস্তায় বা যে এলাকায় যেতাম, অন্য রাস্তায় ফিরতাম। গাড়িতে উঠে চালককে সেই ভাবেই নির্দেশ দিতাম। যার ফলে, ওই দিন আমরা প্রাণে বেঁচে যাই। ৩০ জানুয়ারি কল্যাণী জেনারেল হাসপাতালে প্রহ্লাদ ভৌমিক শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ ঘটনায় চাকদহ ও হরিণঘাটা থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রশাসন ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করে। প্রায় ৫৫ জন জেহাদিকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাগরিক সঙ্ঘের পাশে এসে দাঁড়ান চাকদহ সিংহের হাটের ব্যবসায়ী শচীন বিশ্বাস, শিক্ষক অমর বিশ্বাস। এঁরা দু'জনেই ছিলেন চাকদহ কলোনি এলাকার মাহিষ্য সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতা। এছাড়াও নাগরিক সঙ্ঘের আন্দোলনে যোগ দেন হিন্দু মহাসভা নেতা অভি চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিজু আগরওয়াল। যোগ দেন চাকদহ শহরের শতাধিক রিকশাচালক। নাগরিক সঙ্ঘকর্মীদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশ অব্যাহত থাকে। প্রশাসন বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করে অস্থায়ী পুলিশ চৌকি। ঘটনার প্রায় তিন মাস পর স্থানীয় মানুষের আমন্ত্রণে নদীয়া জেলার নন্দনপুর সীমান্তে যাই। গ্রামবাসীরা সন্ধ্যা হলেই দেশি অস্ত্র নিয়ে রাত পাহারায় বেরিয়ে পড়ে। কারণ বাংলাদেশ রাইফেলসের সহযোগিতায় আগ্নেয়াস্ত্রধারী জেহাদিরা ভারতীয় গ্রামে প্রবেশ করে লুঠপাট চালিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে চলে আসি চাপড়া থানার পদ্মমালায়। মধ্যবর্তী স্থানে গড়ে উঠেছে শিকড়ে কলোনি। সেখানে নিরাপদে বসবাস করছে ২৫টি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পরিবার। তারা মেহেরপুর থেকে এখানে এসে জমি ক্রয় করে রয়েছে মহা সুখে। ফুল কলমি, রাজীবপুর, রেঙ্গীরপোতা, মহাখোলা, হাটখোলা, কৃষ্ণগঞ্জ থানার আসাননগর, ভীমপুর,

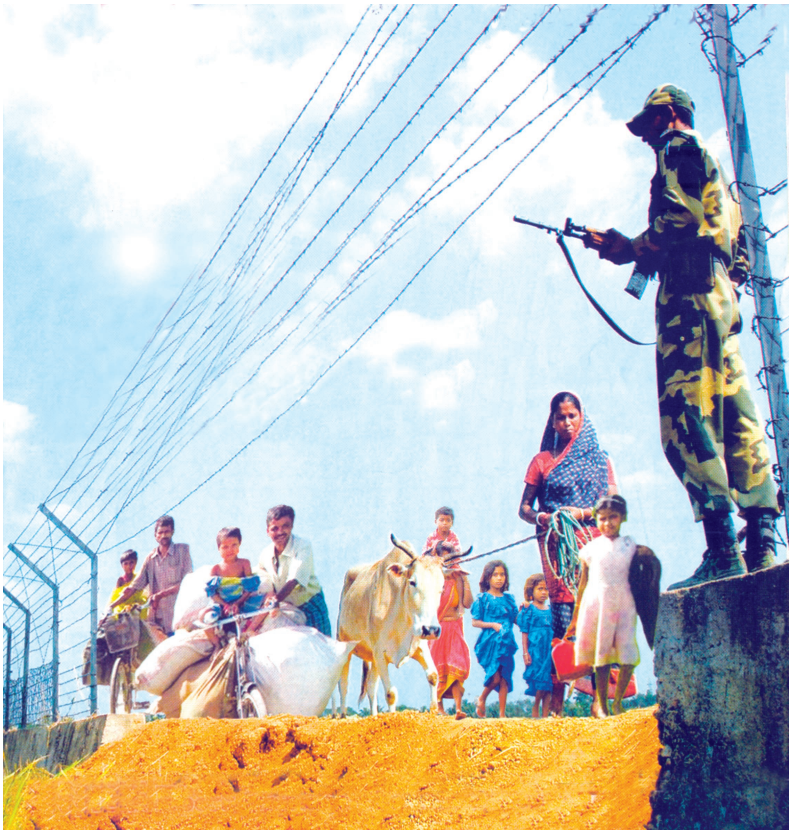

হরিশনগর, গেদে, বানপুর, মাজদিয়া, হাঁসখালি থানার তারকনগর সহ একাধিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গ্রামবাসীরা আতঙ্কে থাকতো। রাতের অন্ধকারে ভারতীয়দের বাড়ি ঘরে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হামলা লুঠ নিয়মিত ছিল। এর কিছুদিন পর তেহট্ট থানার সীমান্ত গ্রাম সাহাপুর পৌঁছে স্থানীয়দের নিকট জানতে পারি অনুপ্রবেশকারীদের নির্যাতনে, একাধিক হিন্দু পরিবার জমি, বাড়ি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করে অন্যত্র চলে গিয়েছে। ওই জমি, বাড়ি ক্রয় করে বসবাস করছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। করিমপুর থানার সীমান্ত গ্রাম ধোরাদহ। সেখানে স্কুলে সরস্বতীপূজার দেবীমূর্তি অনুপ্রবেশকারী জেহাদিরা ভাঙচুর করেছে। এই গ্রামেই কমিউনিস্ট নেতা অনিল বিশ্বাসের বাড়ি। রাতে করিমপুরে একটি আবাসিক লজে বিশ্রাম গ্রহণ করি। পাশের রুমের হইচই শব্দে ঘুম হয় না। সকালে লজ কর্মীর মাধ্যমে জানতে পারি ওরা সবাই বাংলাদেশি চোরাচালানকারী। লজ কর্মীর মন্তব্য— 'দাদা ওদেরই তো রাজত্ব' আমরা কী করব?' মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি সীমান্তে রাস্তার পাশে একটি বাড়ির বারান্দায় বড়ো একটি টিনের কৌটা। নাম তার থানা। দিনে বাংলাদেশিরা এসে কৌটায় ডিউটি বাবদ ৫০ পয়সা ঢুকিয়ে দিয়ে হাট বাজার করে ফিরে যাচ্ছে; রাত্রে হিন্দু বাড়িতে চুরি ডাকাতি করছে।

সাগরপাড়া, কাজিপাড়া, লালগোলা, নসিপুরে তখন ছিল অনুপ্রবেশকারীদের দাপট। নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানার শোনডাঙ্গা গ্রাম। দেশভাগের পর বিনিময় প্রথার মাধ্যমে এপারের মুসলমানরা চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলায়। কুষ্টিয়া জেলার হিন্দুরা চলে আসে এই গ্রামে। কিছুদিন পর বিনিময়কারী মুসলমানরা ফিরে এসে ফারাজ আছে (অংশ আছে) এই দাবি করে সম্পত্তি বলপূর্বক দখল করে নেয়। ফলে এপার-ওপার দুই দিকেই সম্পত্তি হারিয়ে কৃষ্ণনগর শহরে ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয় একাধিক হিন্দু

পরিবার। হাওড়া জেলার বীরশিবপুর কুলগাছিয়া রোডে জল নিকাশি খালের পাশে গড়ে উঠেছে শতাধিক অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমান পরিবারের সুখের সংসার। ঘটম্পুর, রামচন্দ্রপুর গ্রামীণ রাস্তার পাশে ভারতীয়দের জমি ক্রয় করে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা গড়ে তুলেছে কলোনি। সাম্প্রতিক এসআইআর-এর সময় ঝাড়খণ্ডের দুমকায় এরা আত্মগোপনে ছিল। গত ৫০ বছর ধরে অনুপ্রবেশের নিরাপদ করিডোর হিসাবে ব্যবহৃত হতো 'পশ্চিমবঙ্গ'। দিল্লির যন্তর মন্তর, সদর বাজার, করোলবাগ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মুক্ত বিচরণ ক্ষেত্র। ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ি বনাঞ্চলে অহরহ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তৎপরতার সংবাদ পাওয়া যায়। এরা ফাঁদ পেতে বন্য গোসম্পদ ধরে বাংলাদেশে পাচার করতো। বিদেশি নাগরিক অনুপ্রবেশের সঙ্গে গোপনপথে চলে— রেশন সামগ্রী, বিদেশি মুদ্রা, মাদক, আগ্নেয়াস্ত্র, সাপের বিষ, সোনা, ইউরেনিয়াম, নারী ও শিশুপাচার। জেহাদি অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সুন্দরবনের বনপথ ও জলপথ ব্যবহার হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গে বালুরঘাট থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত গোপনে গড়ে উঠেছিল একাধিক রেডিয়ো প্রচার কেন্দ্র। স্বল্প পাল্লার ১০-১২ কিমি ট্রান্সমিটার ব্যবহার করত জেহাদিদের দল। সীমান্ত এলাকায় রেডিয়ো মেরামতকারীদের এই অবৈধ দৌরাত্ম্য দেখেও প্রশাসন ছিল নীরব। রাজনৈতিক নেতারা তখন ছিল নিদ্রামগ্ন। নাগরিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্তার দৃষ্টি আকর্ষণের পর এই প্রচার বন্ধ হয়। চলছে শিক্ষা বিস্তারের আড়ালে বেসরকারি স্কুল-কলেজ নির্মাণ। এসবের পরিকাঠামো গড়তে কয়েক কোটি টাকার প্রয়োজন। এত টাকা এলো কোথা থেকে? সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের বেসরকারি স্কুল-কলেজ কেন? প্রশাসনকে কি অন্ধত্ব গ্রাস করেছিল? প্রতিদিনই সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও ভারতীয় নাগরিকদের ওপর হামলা, অপহরণ, হত্যা চলছিলই। কাঁটাতারের প্রাচীর অনুপ্রবেশকারীদের লক্ষ্যস্থল। মুঘল চরিত্রে এরা বলবান। অবিলম্বে ভারত সরকারের সীমান্ত নীতি পরিবর্তন প্রয়োজন।

এরাজ্যে প্রথম পর্যায়ে মনমোহন রায়ের নেতৃত্বে এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অনুপ্রবেশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। এরপর সীমান্ত চেতনা মঞ্চ-সহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে। তাদের অপরিসীম অবদানের ফলে এরাজ্যে জনজাগরণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্ষমতার মানদণ্ড এতকাল ছিল অনুপ্রবেশ সমর্থনকারীদের হাতে। ফলে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ, বিতাড়ন সম্ভবপর হয়নি।

গত ৪ মে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর সেই কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ-বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু সংগঠনগুলির বহু কর্মী সমর্থক সেকুলারবাদী, দেশদ্রোহীদের হাতে চরম নির্যাতন ও মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছে। তথাপি তাঁরা দেশরক্ষায় অটল ছিলেন। এই আন্দোলনে প্রথম বীরগতি বরণ করেন সুধন্য মল্লিক ও প্রহ্লাদ ভৌমিক। ঘটনাস্থল নদীয়া জেলার হরিণঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের রসুল্লাপুর। বর্তমানে এই অঞ্চলটি বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। বর্তমান বিধায়ক ও সাংসদ দু'জনেই রাষ্ট্রবাদী। বীরদের স্মৃতিরক্ষায় অগ্রসর হলে অপরাধের কী আছে? দুই বীরের রক্তেই এই এলাকায় সনাতন হিন্দু আন্দোলনের ভিত রচিত হয়েছে। আগামী প্রজন্ম এই ইতিহাস যেন ভুলে না যায়। আত্মবলিদানকারী সনাতনীরা যেন উপেক্ষার পাত্র না হন। তাঁদের অবদান যেন স্মরণে রাখে রাজ্যবাসী।

(লেখক নিখিল বঙ্গ নাগরিক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক)

With Best Compliments From -

A

Well Wisher

অতি শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হওয়া প্রয়োজন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ভারতে দেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য একই ফৌজদারি আইন বলবৎ রয়েছে। কিন্তু দেওয়ানি বিধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন আইন মেনে চলার বিধান চালু রয়েছে। যেমন— হিন্দু কোড আইন, মুসলমানদের শরিয়তি আইন প্রভৃতি পৃথকভাবে দেশে বলবৎ রয়েছে। এগুলি মূলত মহিলাদের অধিকার, ব্যক্তিগত আইন, বিবাহ বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ, সম্পত্তির অধিকার, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার ও দত্তক গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক আইনগত বিধান রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার সারাদেশে এখনো ইউসিসি অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করতে পারেনি। তবে গোয়া, উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে ইউসিসি চালু রয়েছে।

সম্প্রতি খবরে জানা গিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগে দিল্লির বঙ্গভবনে জরুরি বৈঠকে বসেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি ইউসিসি কমিটি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইউসিসি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই। এছাড়া রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, রেসিডেন্ট কমিশনার দুষ্মন্ত নারিয়াল, কমিটির সদস্যরা এবং বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে রাজ্যে ইউসিসি কার্যকর করার রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আরও জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশেই ইউসিসি চালুর জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য, উত্তরাখণ্ডে যে মডেলে ইউসিসি কার্যকর করা হয়েছে সেই আদলেই পশ্চিমবঙ্গেও দ্রুত ইউসিসি চালু করা। যেমন--- বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তকগ্রহণ-সহ ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে অভিন্ন বিধান কার্যকর করার লক্ষ্যে রাজ্যের সামাজিক ও আইনি বাস্তবতা খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ইউসিসি কার্যকর করার আগে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় সমীক্ষা চালানো হবে এবং এই আইনের সপক্ষে সমর্থন তৈরিরও চেষ্টা করা হতে পারে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে যেগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে, সেগুলি হলো— শরিয়ত আইনে নির্বাচিত বিয়ের ন্যূনতম বয়স পরিবর্তন হবে। বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ হবে। সংশোধিত হবে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬)। এছাড়া ইউসিসি লাগু হলে সারারাজ্যে বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দত্তক ও উত্তরাধিকারের আইন অভিন্ন হবে। এই অবস্থায় নারীরা সম্পত্তিতে সমান অধিকার পাবেন। ইউসিসি আসলে একটি সাধারণ আইন, যা সব সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪-এ উল্লেখ রয়েছে ভারতীয় সকল নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরির প্রচেষ্টা করবে সরকার। এ সম্পর্কে অনেকেই বলে থাকেন--- সেকুলার দেশে মানুষের ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু যুক্তি বলে-— সেকুলার দেশ বলেই তো ধর্মের ভিত্তিতে আইনি বিচার মানুষ পাবেন না, পাবেন এক দেশ এক বিধানের ভিত্তিতে। যার জীবন্ত উদাহরণ গোয়া। সেখানে জনজাতি রয়েছে, খ্রিস্টান রয়েছে, হিন্দু, মুসলমান সবাই রয়েছেন। কিন্তু ওই রাজ্যে ব্যক্তিগত কোনো আইন নেই। সংবিধানের আইনেই সবাই চলে। তবে কি সেখানে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে? হচ্ছে না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গেও যদি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করা হয় তাহলেও এরাজ্যে কারও কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন তো হবেই না বরং নিজের ধর্ম পালনে শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পাবে।

ভারতীয় সংবিধানে একদিকে যেমন সকলের জন্য সমানাধিকারের কথা বলা আছে, অন্যদিকে দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করতে সরকারকে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রাজ্যে দেওয়ানি বিধি প্রণীত হলে তা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই বিধি কার্যকর হলে বাতিল হবে সব পারিবারিক আইন। পারিবারিক বিষয়ে সবক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার থাকবে। ধর্মনির্বিশেষে বিবাহের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হবে। সব সম্প্রদায়ের নাবালিকা বিবাহ নিষিদ্ধ, বহু বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। সমস্ত ক্ষেত্রেই বিবাহ বিচ্ছেদ হবে আদালতের মাধ্যমে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও দত্তক নেওয়ার অধিকারী হবে। অর্থাৎ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, খোরপোষ, অভিভাবকত্ব, দত্তক নেওয়া, উত্তরাধিকার প্রভৃতি পারিবারিক এবং সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সব বিষয়গুলি দেওয়ানি বিধির আওতায় আসবে। এইসব বিষয়ে লক্ষ্য রেখেই এরাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি চালু করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো বিশেষ প্রয়োজন। □

নবাঙ্কুর

সব সময় একই চালাকি খাটে না

এক ব্যবসায়ী নুনের কারবার করত। একবার সে খবর পেল এক জায়গায় খুব সস্তায় নুন পাওয়া যাচ্ছে। শোনামাত্র সে ঠিক করে নিল সেখান থেকে যতটা সম্ভব বেশি করে নুন কিনে নিয়ে আসবে।

পরদিন সে সেখানে চলে এল এবং সেখান থেকে প্রচুর নুন কিনে একটি বলদের পিঠে চাপিয়ে ফিরে আসছিল। এর আগে সে যত পরিমাণ জিনিস কিনত, এবারে এই নুনের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি। বলদের খুব কষ্ট হতে লাগল।

এভাবে যেতে যেতে বলদটি খুব কাতর হয়ে পড়ল। শেষে রাস্তার ধারে একটা নালার উপরের সাঁকোর উপর দিয়ে পেরোবার সময় ইচ্ছে করে জলের মধ্যে পড়ে গেল। তারফলে অনেকটা নুন গলে গেল। পিঠের বোঝা কম হবার কারণে সে আরামে চলতে লাগল।

ব্যবসায়ী পরদিন আবার ওই বলদটিকে নিয়ে নুন কিনতে গেল। ফিরে আসার সময় সেদিনও একই ঘটনা ঘটল। পরপর দুদিন একই ঘটনা ঘটতে দেখে ব্যবসায়ী বলদের চালাকিটা ধরে ফেলল। ব্যবসায়ী মনে মনে বলল—ঠিক আছে, এবার একে জব্দ করতে হবে।

তার পরদিন ব্যবসায়ী আবার নুন কিনতে গেল, কিন্তু নুনের বদলে বেশি করে তুলো কিনে বলদের পিঠে চাপিয়ে দিল। বলদ তো ভাবল, ঠিক আছে, আগের মতোই সে জলে পড়ে গিয়ে বোঝার ভার হালকা করে নেবে।

ফিরে আসার সময় পথের ধারে ওই নালার কাছে এসে বলদটি যথারীতি ইচ্ছে করে জলে পড়ে গেল। ব্যবসায়ী কিন্তু আর তাড়াহুড়ো করে বলদটিকে জল থেকে তোলার চেষ্টা করল না। বেশ খানিকটা সময় পরে ধীরে সুস্থে তাকে জল থেকে তুলল।

অনেকক্ষণ জলে থাকার ফলে তুলো ভিজে আরও ভারী হয়ে গেল। আগে তাকে যে ভার বইতে হচ্ছিল এখন তার থেকে অনেক বেশি ভার বইতে হচ্ছে। বেচারা বলদ সবসময় একই চালাকি করতে গিয়ে বিপদে খুবই পড়ল। সেদিন থেকে বলদটি তার ভুল বুঝতে পারল । আর কোনোদিন কাজে ফাঁকি দেওয়ার বা চালাকি করার চেষ্টা করল না।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

গুগামাল

গুগামাল জাতীয় উদ্যান মহারাষ্ট্র রাজ্যের অমরাবতী জেলার সাতপুরা পাহাড়ের খাঁজে অবস্থিত। ১৯৭৪ সালে এই উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মোট আয়তন ৩৬১.২৮ বর্গকিলোমিটার। এটি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেলঘাট টাইগার রিজার্ভের উল্লেখযোগ্য অংশ। এই উদ্যানের জঙ্গল মূলত শুষ্ক পর্ণমোচী প্রকৃতির। সেগুনগাছের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি। এছাড়া আমলকি, ধাওয়াড়া, কুসুম এবং ব্যাপক বাঁশঝাড় রয়েছে। বন্যপ্রাণীর মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, শ্লথ ভল্লুক, সম্বর হরিণ, নীলগাই এবং বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদর দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার জলাশয়ে ২৫ রকমের মাছ ও বহু প্রজাতির প্রজাপতি রয়েছে। এই উদ্যানের প্রধান আকর্ষণ হলো এর রোমাঞ্চকর সাফারি, যেখান থেকে পর্যটকরা বিভিন্ন প্রাণীকে দেখতে পারেন।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২৮

সংখ্যয়

একত্রিংশত- ৩১
দ্বাত্রিংশত- ৩২
ত্রয়স্ত্রিংশত-৩৩
চতুস্ত্রিংশত-৩৪
পঞ্চত্রিংশত- ৩৫
ষটত্রিংশত- ৩৬
সপ্তত্রিংশত- ৩৭
অষ্টত্রিংশত- ৩৮
নবত্রিংশত- ৩৯
চত্বারিংশত- ৪০

(একটি পদক্ষেপ সংস্কৃতের পথে)

ভালো কথা

ঘুমের মধ্যে আরতি দর্শন

গত বছর অক্টোবর মাসে আমরা মায়াপুর গিয়েছিলাম। ভোরবেলা কাশিমবাজার রেলস্টেশন থেকে ট্রেন ধরেছিলাম। সবুজ মাঠ, কত গাছপালা, ঘরবাড়ি পেরিয়ে কৃষ্ণনগর স্টেশনে নামলাম। ঘাট পার হয়ে মায়াপুর পৌছালাম। বড়ো খোলা দরজা। ভেতরে ঢুকলাম। এক মাতাজী চন্দন-তিলক পরিয়ে দিলেন। খুব আনন্দ হচ্ছিল। মন্দিরের চাতালে খোল-খঞ্জনি বাজছিল। ঠাকুরের সামনে আমরা বসে পড়লাম। একটু পরে প্রসাদ পেলাম। তারপর গোশালা দেখলাম। কয়েকটি বাছুরের মুখে ঘাস তুলে দিলাম। সুন্দর সুন্দর ফুলগাছের বাগান দেখলাম। মিউজিয়ামে অনেক সময় কাটালাম। খুব ভালো লাগছিল। বাবা-মা'র সন্ধ্যেবেলায় আরতি দেখার ইচ্ছা ছিল। আমারও আরতি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। দিদি জানালো, কাল সকালে কলেজে যেতে হবে, তাই আজই বাড়ি ফিরতে হবে। অগত্যা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে আরতি দর্শন করলাম।

জৈত্রী মণ্ডল, পঞ্চম শ্রেণী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মা আসছে

সায়নী চক্রবর্তী, একাদশ শ্রেণী, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া

বর্ষা শেষে শরৎ এসেছে
তবু ঝরছে বৃষ্টি,
সবাই কিন্তু ভয়ে ভয়ে
একি অনাসৃষ্টি!
কদিন আগে নেপালেতে
এলো হড়পা বান,
এক নিমেষে জনজীবন
করল খান খান।

প্রকৃতিদেবী রুষ্ট কেন
বুঝতে পারি সবাই,
তবু অলস মনে বসে থাকি
যেন করার কিছু নাই।
পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রা
গ্রহণ করলে পরে,
রুষ্ট প্রকৃতি শান্ত হবে
জীবজগৎ সব বাঁচবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

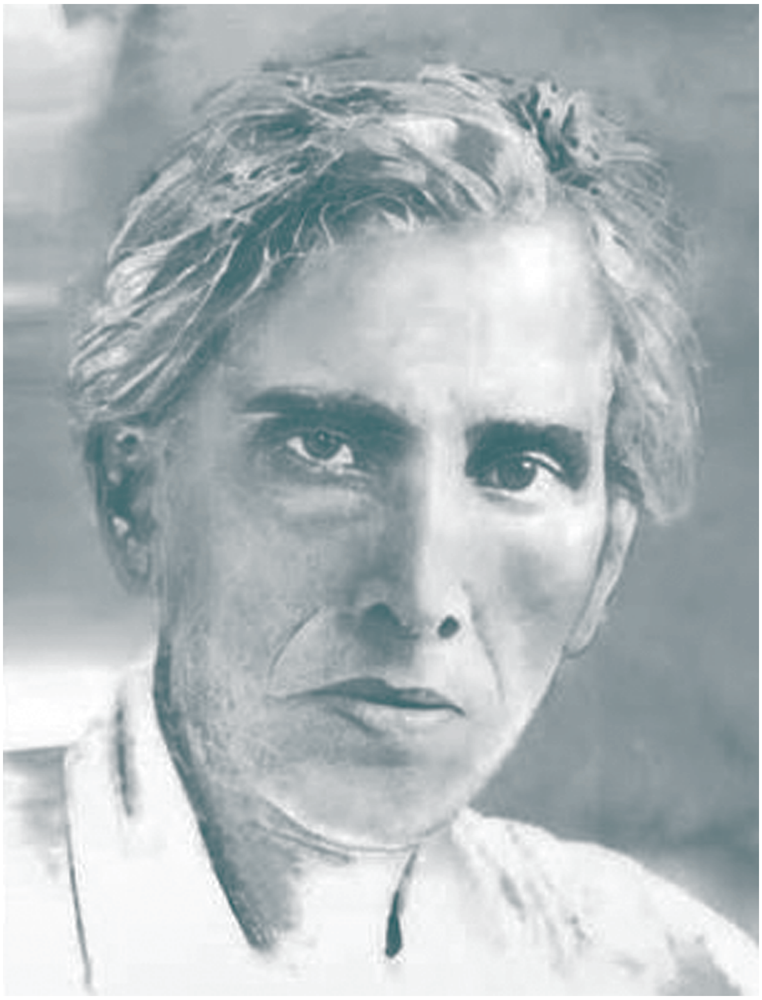

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শুধু জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে চিহ্নিত করলে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে খাটো করা হবে। তিনি ছিলেন সমাজবিশ্লেষক, মানবতাবাদী, জাতীয়তাবাদী চিন্তক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নীরব সহযোদ্ধা। তাঁর সাহিত্য যেমন সমাজের নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল, তেমনই তাঁর ব্যক্তিজীবনও স্বাধীনতার স্বপ্নে নিবেদিত ছিল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: সাহিত্য, সমাজচেতনা ও জাতীয়তাবোধের অন্তর্লীন সেতুবন্ধন

সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁদের সাহিত্যকর্ম কেবল শিল্পসৃষ্টি নয়, একটি যুগের সমাজমনস্ক দলিল। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' বলা হয় শুধু তাঁর অসাধারণ গল্প লেখার ক্ষমতার জন্য নয়; বরং মানুষের অন্তর্জীবন, সামাজিক বৈষম্য, প্রেম, প্রতিবাদ, নারীর অবস্থান এবং জাতীয় চেতনার যে বহুমাত্রিক প্রকাশ তাঁর রচনায় ঘটেছে, তা বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে। তাঁর রচিত সাহিত্য একই সঙ্গে আবেগের, বাস্তবতার এবং সামাজিক প্রতিরোধের ভাষ্য।

দারিদ্র্য থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম : হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে শরৎচন্দ্রের জন্ম। শৈশবের একটি বড়ো অংশ কেটেছে ভাগলপুরে। অর্থনৈতিক সংকট তাঁর শিক্ষাজীবনকে অসম্পূর্ণ রেখে দেয়। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এফ.এ. পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না পারায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু এই অসমাপ্ত শিক্ষাই তাঁর জ্ঞানার্জনের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। বরং জীবনই হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

এক সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভ্রমণ, বনেদি রাজ-এস্টেটে চাকরি, পরে কলকাতা হাইকোর্টে অনুবাদকের কাজ এবং বার্মা রেলওয়েতে কেরানির চাকরি— এই বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর সাহিত্যকে বাস্তবের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা তিনি দেখেছিলেন দূর থেকে নয়, তাঁদের মধ্যেই বসবাস করে।

ফ ঃ ৬

সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ও সৃজনশীলতার বিস্তার : অল্প বয়সেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন শরৎচন্দ্র। ভাগলপুরে অবস্থানকালে তিনি রচনা করেন বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ-এর মতো উপন্যাস এবং অনুপমার প্রেম, আলো ও ছায়া, বোঝা-র মতো উল্লেখযোগ্য গল্প।

ভারতী পত্রিকায় বড়দিদি প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্যজগতে তাঁর আবির্ভাব এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ সমকালীন সাহিত্যিকরা তাঁর ভাষার সহজতা এবং চরিত্র নির্মাণের অসাধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হন।

এই সময়ের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো 'মন্দির' গল্প। কুন্তলীন সাহিত্য প্রতিযোগিতায় গল্পটি পাঠানো হয়েছিল তাঁর মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে। কিন্তু বিচারকমণ্ডলী সেটিকেই শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে নির্বাচন করেন। এই ঘটনা শুধু তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার স্বীকৃতিই নয়; বরং ব্যক্তিগত প্রচারের প্রতি তাঁর অনাসক্তিরও পরিচয় বহন করে। রেঙ্গুনে অবস্থানকালে লেখা 'রামের সুমতি' প্রকাশের পর যমুনা, ভারতবর্ষ, সাহিত্য-সহ বিভিন্ন খ্যাতনামা পত্রিকা থেকে নিয়মিত লেখার আহ্বান আসতে থাকে। ১৯১৬ সালে বঙ্গে ফিরে এসে হাওড়ার শিবপুরে বসবাস শুরু করেন। এই সময়েই তাঁর সৃষ্টিশীলতার অন্যতম উজ্জ্বল পর্ব শুরু হয় এবং বাংলা সাহিত্যের বহু কালজয়ী রচনা জন্ম নেয়।

সাহিত্য থেকে রাজনীতি : ভারতীয় জাতীয়তাবোধের এক মানবিক রূপ— শরৎচন্দ্রকে কেবল সাহিত্যিক হিসেবে বিচার করলে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আড়ালেই থেকে যায়। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে তিনি সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২২ সালে পদত্যাগ করতে চাইলেও দেশবন্ধুর অনিচ্ছায় সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি।

এখানেই লক্ষণীয়, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত; কিন্তু তিনি কখনও সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। বরং ব্রিটিশ-বিরোধী ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে বিভিন্ন ধারার সহাবস্থানকে তিনি বাস্তবতার চোখে দেখেছিলেন।

বিপ্লবীদের সহযোদ্ধা শরৎচন্দ্র : দেশবন্ধুর বাড়িতে যাতায়াতের সূত্রে প্রথম সারির বহু বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায়, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রমুখ ছিলেন তাঁর নিকটজন। তাঁর মামা বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও ছিলেন একজন বিপ্লবী।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'পথের দাবী' উপন্যাস। এই গ্রন্থ রচনার সময় তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এমনকী 'চরিত্রহীন' ও 'পথের দাবী' গ্রন্থস্বত্ব বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে ব্যবহারের জন্য বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে দিতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর ব্যক্তিগত সাহিত্যিক সাফল্যের ঊর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দেওয়ার দৃষ্টান্ত।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, তিনি বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহেও সহায়তা করতেন। বিপ্লবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের আগে সামতাবেড়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আবার আত্মগোপনে থাকা মাস্টারদা সূর্য সেনের জন্য নিজের সঞ্চিত পাঁচ হাজার টাকা বিপ্লবী কালীপদ ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে, শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেম কেবল সাহিত্যিক আবেগে সীমাবদ্ধ ছিল না; তা বাস্তব কর্মের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছিল।

সামতাবেড় : সৃষ্টির নীরব আশ্রয়— রূপনারায়ণ নদীর তীরে সামতাবেড় গ্রাম শরৎচন্দ্রের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানেই তিনি প্রকৃতির নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বসবাস শুরু করেন। যদিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই সময়ে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি তুলনামূলকভাবে কমে যায়, তবুও এই পর্যায় তাঁর জীবনদর্শনকে আরও গভীর করে তোলে। পরবর্তীকালে কলকাতার বালিগঞ্জেও তিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেন এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে যাতায়াত বজায় রাখেন।

অন্তিম জীবন ও উত্তরাধিকার : জীবনের শেষ কয়েক বছর দীর্ঘ অসুস্থতায় ভুগেছিলেন শরৎচন্দ্র। আরোগ্যের আশায় দেওঘর গেলেও সুস্থতা ফিরে আসেনি। পরবর্তীকালে তাঁর যকৃতে ক্যানসার ধরা পড়ে এবং রোগটি পাকস্থলীতেও ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার পার্ক নার্সিংহোমে প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্রোপচার করলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মাত্র একষট্টি বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শুধু জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে চিহ্নিত করলে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে খাটো করা হবে। তিনি ছিলেন সমাজবিশ্লেষক, মানবতাবাদী, জাতীয়তাবাদী চিন্তক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নীরব সহযোদ্ধা। তাঁর সাহিত্য যেমন সমাজের নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল, তেমনই তাঁর ব্যক্তিজীবনও স্বাধীনতার স্বপ্নে নিবেদিত ছিল।

বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের অবদান তাই কেবল ভাষা বা কাহিনির সাফল্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর রচনায় আমরা দেখতে পাই এক যুগের সামাজিক বিবর্তন, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনার উন্মেষ এবং মানুষের প্রতি এক গভীর মানবিক বিশ্বাস। সাহিত্য ও ইতিহাস— এই দুই ধারার সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ তাঁর কলম সকলকে শেখায় যে, প্রকৃত সাহিত্য মানুষের জীবনের সত্যকে ধারণ করে, আর প্রকৃত দেশপ্রেম মানুষের মুক্তির স্বপ্নকে লালন করে। □

শোক সংবাদ

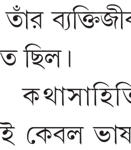

বাঁকুড়া জেলার খাতড়ার স্বয়ংসেবক বিধান আখুলীর কাকিমা রাধারাণী আখুলী গত ২৩ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ৫ কন্যা, ১ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

জিএসএলভি-এফ১৭

ভারতের মহাকাশ সক্ষমতার নতুন মাইলফলক

সোমনাথ গোস্বামী

গত ৪ সেপ্টেম্বর ভোরে শ্রীহরিকোটার আকাশে জিএসএলভি-এফ১৭-এর উৎক্ষেপণ ছিল নিছক আর একটি রকেট উৎক্ষেপণ নয়। এই অভিযানের আসল গুরুত্ব লুকিয়ে রয়েছে তার বহন করা ইওএস-০৫ উপগ্রহ এবং তাকে পৃথিবীর প্রায় ৩৬ হাজার কিলোমিটার উচ্চতার ভূ-সমলয় কক্ষপথে স্থাপনের ক্ষমতায়। ইওএস-০৫ হলো ভারতের প্রথম এমন পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী চিত্রগ্রহণ উপগ্রহ, যা এই ধরনের কক্ষপথ থেকে বৃহৎ অঞ্চলের উপর ঘন ঘন নজর রাখার জন্য তৈরি। এই প্রযুক্তি ভারতের পৃথিবী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে শুধু আরও শক্তিশালী করবে না, তথ্য সংগ্রহ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। বিশ্বের মহাকাশ কর্মসূচির মধ্যেও এই ধরনের ভূ-সমলয় কক্ষপথ থেকে চিত্রগ্রহণের ক্ষমতা এখনও হাতে গোনা কয়েকটি দেশের রয়েছে।

একটি উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠানো এবং তাকে সঠিক কক্ষপথে স্থাপন করা--- এই দুটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রযুক্তিগত কাজ। উৎক্ষেপণযানকে প্রথমে উপগ্রহকে নির্দিষ্ট গতিপথে পৌঁছে দিতে হয়, তারপর উপগ্রহের নিজস্ব ইঞ্জিন ব্যবহার করে ধাপে ধাপে কক্ষপথের উচ্চতা ও অবস্থান ঠিক করতে হয়। জিএসএলভি-এফ১৭ সেই প্রথম কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। উৎক্ষেপণের প্রায় ১৮ থেকে ১৯ মিনিট পর ইওএস-০৫-কে নির্ধারিত উপ-ভূসমলয় স্থানান্তর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এরপর ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর উপগ্রহটির কক্ষপথ উন্নীত করার প্রক্রিয়াও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ উৎক্ষেপণের সাফল্যের পাশাপাশি মহাকাশে একটি ভারী ও অত্যাধুনিক উপগ্রহকে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে এগিয়ে নেওয়ার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটিও সঠিক পথে এগিয়েছে।

ইওএস-০৫-এর গুরুত্ব বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ আসলে কী করে। উপগ্রহের ক্যামেরা শুধু মানুষের চোখের মতো ছবি তোলে না। তার সংবেদক পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত বা নির্গত বিভিন্ন ধরনের তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ সংগ্রহ করে। দৃশ্যমান আলো, অবলোহিত তরঙ্গ কিংবা বিভিন্ন বর্ণালির তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন কোথায় জল, কোথায় ফসল,

কোথায় বন, কোথায় মেঘ, কোথায় মাটির পরিবর্তন ঘটছে। এমনকি মানুষের চোখে প্রায় একই রকম দেখতে দু'টি এলাকার মধ্যেও উপগ্রহের সংবেদক রাসায়নিক বা ভৌত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য শনাক্ত করতে পারে। ফলে উপগ্রহের ছবি আসলে শুধুই ছবি নয়— এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠ সম্পর্কে পরিমাপযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের একটি বিশাল ভাণ্ডার।

এতদিন ভারতের অধিকাংশ পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ নিম্ন পৃথিবী কক্ষপথ বা সূর্যসমলয় মেরু কক্ষপথে কাজ করেছে। এই কক্ষপথগুলির বড় সুবিধা হলো উপগ্রহ পৃথিবীর অনেক কাছ দিয়ে যায়, ফলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে একইভাবে বারবার দেখতে হলে উপগ্রহকে আবার সেই অঞ্চলের উপর দিয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে অত্যন্ত বিস্তারিত ছবি পাওয়া গেলেও একই জায়গার পরবর্তী ছবি পেতে অপেক্ষা করতে হতে পারে। পৃথিবীর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিভিন্ন ভৌগোলিক ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে এই সময়ের ব্যবধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইওএস-০৫ এই জায়গাতেই ভারতের পৃথিবী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় একটি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে।

ভূ-সমলয় কক্ষপথ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে— প্রায় ৩৫ হাজার ৭৮৬ কিলোমিটার উচ্চতায়। সেখানে উপগ্রহের কক্ষপথের গতি পৃথিবীর ঘূর্ণনের সঙ্গে এমনভাবে সমন্বিত করা যায় যে পৃথিবীর একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর থেকে সেটি প্রায় একই অবস্থান বজায় রেখে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। দূরত্ব বেশি হওয়ায় কাছের কক্ষপথের মতো একই মাত্রার সূক্ষ্মতা সব ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না; কিন্তু এর বিনিময়ে পাওয়া যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সুবিধা— একটি বৃহৎ অঞ্চলকে ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা।

ফলে কোনও নদীর জল দ্রুত বাড়ছে কি না, কোনও ঘূর্ণিঝড়ের মেঘমালা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, কোথাও আগুন ছড়িয়ে পড়ছে কি না— এই ধরনের দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা সহজ হয়।

এখানেই ইওএস-০৫-এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব। এর ক্ষমতা শুধু আরও একটি উন্নত ছবি তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; আসল পরিবর্তন হলো সময়ের সঙ্গে একই বৃহৎ অঞ্চলের পরিবর্তনকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করার ক্ষমতা। একটি মাত্র ছবি বলে দেয় কোনও মুহূর্তে পরিস্থিতি কেমন। কিন্তু একই এলাকার পরপর সংগৃহীত একাধিক ছবি বলে দেয় পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে এবং কত দ্রুত বদলাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শুধু বর্তমান অবস্থার ছবি যথেষ্ট নয়— পরিবর্তনের গতিপথ জানা অনেক সময় আরও বেশি প্রয়োজনীয়। ইওএস-০৫ সেই ধারাবাহিক তথ্য সংগ্রহের পরিসরকে প্রসারিত করবে।

ধরা যাক, কোনো অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। একটি উপগ্রহের ছবি থেকে বোঝা গেল কোথায় জল জমেছে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর জল কোন দিকে ছড়াচ্ছে, কোন এলাকা নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে এবং কোথায় পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে— এই তথ্য দ্রুত পাওয়া গেলে উদ্ধার ও ত্রাণের সিদ্ধান্ত আরও নির্ভুল হতে পারে। একইভাবে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে মেঘের বিন্যাস ও গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ, বনাঞ্চলে আগুনের বিস্তার চিহ্নিত করা কিংবা উপকূলীয় অঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উপগ্রহ সরাসরি সিদ্ধান্ত নেয় না; সে তথ্য দেয়। সেই তথ্যকে বিশ্লেষণ করে আবহাওয়াবিদ, প্রশাসন, দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা সংস্থা এবং বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ উপগ্রহের তথ্য যত সময়োপযোগী ও নির্ভুল হবে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিও তত শক্তিশালী হবে।

কৃষিক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তির গুরুত্ব কম নয়। জমিতে ফসলের বৃদ্ধি, জলাভাব, অতিরিক্ত আর্দ্রতা কিংবা দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে ধারাবাহিক উপগ্রহ-তথ্য ব্যবহার করা যায়। একইভাবে বনভূমির পরিবর্তন, জলাধারের পরিস্থিতি, নগর সম্প্রসারণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের উপর নজর রাখতেও এই তথ্য কাজে লাগবে। ইওএস-০৫-এর দৃশ্যমান, অবলোহিত, বহুবর্ণাল এবং অতিবর্ণাল পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা পৃথিবীর পৃষ্ঠের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে আলাদা করে শনাক্ত করার সুযোগ আরও বাড়াবে। ফলে একই এলাকার উপর সময়ের সঙ্গে সংগৃহীত তথ্য মিলিয়ে পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক চিত্র তৈরি করা সম্ভব হবে।

এই সাফল্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক জিএসএলভি-এফ১৭ নিজেই। এটি ভারতের ভূ-সমলয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণযানের ১৯তম উড়ান এবং এখনও পর্যন্ত এই উৎক্ষেপণযান-শ্রেণীর সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ বহন করেছে— প্রায় ২,৩৬৭ কিলোগ্রাম ওজনের ইওএস-০৫। তিন-ধাপের এই উৎক্ষেপণযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত অংশগুলির একটি হলো দেশীয় অতিশীতল ইঞ্জিন। অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় তরল অক্সিজেন ও তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করে এই ইঞ্জিন উচ্চ দক্ষতায় প্রয়োজনীয় ধাক্কা তৈরি করে। ভারী উপগ্রহকে উচ্চ কক্ষপথের দিকে পাঠানোর ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎক্ষেপণযানের এই ক্ষমতা যত বৃদ্ধি হয়, তত বেশি ওজনের এবং জটিল উপগ্রহকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পাঠানোর সুযোগও বাড়ে।

এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার ইতিহাসও। ২০২১ সালে জিএসএলভি-এফ১০-এর মাধ্যমে ইওএস-০৩ উৎক্ষেপণের চেষ্টা সফল হয়নি; মাল্টি-স্টেজ ক্রায়োজেনিক (বহুস্তরীয় অতিশীতল) রকেট ইঞ্জিনের ইঞ্জিন-স্তরের অস্বাভাবিকতার কারণে সেই অভিযান নির্ধারিত ফল দিতে পারেনি। মহাকাশ প্রযুক্তিতে এমন ব্যর্থতা কিন্তু শেষ কথা নয়। বরং প্রতিটি ব্যর্থতা পরবর্তী নকশা, পরীক্ষা এবং প্রক্রিয়াকে সাফল্যের পথে পরিচালনার সুযোগ তৈরি করে। পাঁচ বছর পর জিএসএলভি-এফ১৭-এর সফল উৎক্ষেপণ তাই শুধু একটি নতুন অভিযানের সাফল্য নয়— এটি দীর্ঘ প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা, সংশোধন এবং পরীক্ষা- নিরীক্ষাগত ধারাবাহিকতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল। মহাকাশ গবেষণায় সাফল্য কখনও একটি দিনের জন্য শিরোপা অর্জন নয়; তার পিছনে থাকে বহু বছরের পরীক্ষা, পরিমাপ, সংশোধন এবং পুনরায় পরীক্ষার কঠিন পথ।

আরও বড়ো বিষয় হলো, ইওএস-০৫-এর মাধ্যমে ভারত পৃথিবী পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে কক্ষপথের একটি নতুন সুবিধাকে নিজের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছে। এতদিন কাছ থেকে অত্যন্ত বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ এবং দূর থেকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ— এই দুই ধরনের ক্ষমতার মধ্যে একটি কার্যকর বিভাজন ছিল। ইওএস-০৫ সেই ব্যবস্থায় এমন একটি নতুন স্তর যোগ করছে, যেখানে বৃহৎ অঞ্চলের উপর থেকে বারবার উচ্চমানের চিত্র এবং বর্ণালিগত তথ্য সংগ্রহের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এর ফলে পৃথিবী পর্যবেক্ষণের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য— স্থানিক বিশদতা ও সময়ের ঘনত্বকে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ বাড়বে। ভারতের নিজস্ব উপগ্রহ থেকে এই তথ্য পাওয়ার অর্থ হলো দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ (পলিসি ডিসিশন) ব্যবস্থার জন্য একটি শক্তিশালী দেশীয় তথ্যভিত্তি আরও বিস্তৃত হওয়া।

শেষপর্যন্ত মহাকাশ প্রযুক্তির সাফল্যকে শুধু উৎক্ষেপণযানের উচ্চতা বা উপগ্রহের কক্ষপথ দিয়ে বিচার করলে তার আসল মূল্য বোঝা যায় না। একটি উৎক্ষেপণযান কয়েক মিনিটে আকাশ পেরিয়ে যায়, কিন্তু তার বহন করা উপগ্রহ বছরের পর বছর পৃথিবী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। সেই তথ্য যদি বন্যার জল কোথায় যাচ্ছে তা দ্রুত জানায়, কৃষিজমির পরিবর্তন ধরতে সাহায্য করে, আগুনের বিস্তার বোঝায়, পরিবেশের ক্ষয় শনাক্ত করে কিংবা দ্রুত বদলে যাওয়া কোনও পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশাসনকে আরও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, তখন মহাকাশ প্রযুক্তি আর দূরের কোনও বিজ্ঞান থাকে না; তা সরাসরি মানুষের জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। জিএসএলভি-এফ১৭-এর সাফল্যের প্রকৃত তাৎপর্য এখানেইঃ ভারত শুধু মহাকাশে আরও একটি উপগ্রহ পাঠায়নি; পৃথিবীকে আরও ঘন ঘন, আরও বৈজ্ঞানিকভাবে এবং আরও নিজের চোখে দেখার ক্ষমতা অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করেছে।

(লেখক স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ)

পিতাশ্রী শ্রী ভঁওরলালজী মল্লাবত লাভ করেছিলেন ইচ্ছামৃত্যু

অরুণ প্রকাশ মল্লাবত

ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি, পিতামহ ভীষ্মই ছিলেন এমন এক মহাপুরুষ, যিনি ইচ্ছামৃত্যুর বর লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমার নিজের জীবদ্দশায়, নিজের পরিবারেই আমি আমার পিতাশ্রী ভঁওরলালজীকে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে দেখেছি।

তখন আমার বয়স ২০ বছরও পূর্ণ হয়নি। পিতাজী দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত। কিন্তু তিনি আমাদের পরিবারের কাউকেই তা বুঝতে দেননি। সবসময় বলতেন, 'আমার লিভারের হজমশক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে। তাই আমি আয়ুর্বেদিক ওষুধ কালমেঘ ও গোমূত্র সেবন করছি।'

ঘটনাটি ১১ মে, ১৯৭৬ সালের। সকাল ১১টা নাগাদ তাঁর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক পণ্ডিত গোবর্ধনজী শাস্ত্রী (বৈদ্যজী) বাড়িতে এলেন। পিতাজী তখন শুয়েছিলেন। বৈদ্যজী তাঁর পাশে এসে বসলেন। পিতাজী তাঁকে প্রণাম করে বললেন— 'বৈদ্যজী, আপনি তো পঞ্চাঙ্গের ভালো জ্ঞান রাখেন। একটু পঞ্চাঙ্গ দেখে আমার এই সংসার থেকে বিদায় নেওয়ার শুভ সময়টি নির্ধারণ করে দিন।'

বৈদ্যজী তাঁর ব্যাগ থেকে পঞ্চাঙ্গ বের করে দেখলেন এবং বললেন, 'শুভ সময় তো পরশু, ১৩ মে, সকাল ১১টা। সেদিন পূর্ণিমাও।'

পিতাজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা বৈদ্যজী, তাহলে এই সংসার থেকে আমার প্রস্থান পরশুই নির্ধারিত হলো।'

বৈদ্যজী বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে'— এই বলে তাঁর নাড়ি ও জিহ্বা পরীক্ষা করতে শুরু করলেন।

১৯৭৬ সালের ১২ মে সকালে পিতাজীর পরম বন্ধু ও সহযোগী শ্রী বলদেব প্রসাদজী গনেড়িওয়াল বাড়িতে এলেন। তিনি পিতাজীর শরীরের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তখন পিতাজী তাঁকে বললেন— 'আজ রাতে আমি স্বয়ং পরমেশ্বরের দর্শন পেয়েছি। তিনি আগামীকাল, ১৩ মে সকাল ১১টায় আমাকে এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।'

বলদেবজী তাঁর স্বভাবসুলভ হাস্যরসের সঙ্গে হেসে বললেন, 'ভঁওরজী, আপনি ভগবানকে কেন বললেন না যে ছেলে-মেয়েরা এখনো খুব ছোটো, কারও বিয়ে হয়নি, কাউকে কাজকর্মেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। আর কয়েকটা বছর অপেক্ষা করতে পারতেন!'

পিতাজী ছিলেন অত্যন্ত রসিক ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি মৃদু হেসে বললেন— 'বলদেবজী, আপনার প্রশ্নের দুটি উত্তর আছে। প্রথমত, আপনি ব্যবসায়ী মানুষ, তাই দরদাম করতে জানেন। কিন্তু আমরা চাকরিজীবী মানুষ। তাই ভগবানের আদেশ পেয়ে আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দিয়ে দিয়েছি। দ্বিতীয়ত, সন্তানদের কাজকর্ম ও ভবিষ্যতের কথা যদি বলেন, তাহলে আমি আমার ৪৬ বছরের জীবনে এমন অনেক উদাহরণ দেখেছি— যেখানে পূর্বপুরুষেরা কোটি কোটি, এমনকী শত শত কোটি টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন, অথচ তাঁদের সন্তানদের পরবর্তীকালে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে, ভিক্ষা করতেও বাধ্য হতে হয়েছে। আবার এমন পরিবারও দেখেছি, যাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় কিছুই রেখে যেতে পারেননি, অথচ তাঁদের সন্তান ও পরিবার সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করছেন। তাই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আগামীকাল, ১৩ মে সকাল ১১টাতেই আমার প্রস্থান

নির্ধারিত হয়েছে।'

এরপরও বিভিন্ন কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা নিয়মিত পিতাজীর সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁর শরীরের খবর নিতে আসছিলেন।

একজন কর্মী পিতাজীকে জানালেন যে পরদিন পূর্ণিমা এবং একই সঙ্গে চন্দ্রগ্রহণও রয়েছে। শ্মশানঘাটের কাজকর্মে দেরি হলে গ্রহণ শুরু হয়ে যাবে এবং সেই সময় মানুষ আবার বাড়িতে ফিরে এসে খাবার খেতে পারবেন না।

পিতাজী চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ প্রভুর ধ্যান করলেন। তারপর বললেন— 'তাহলে আমার প্রস্থানের সময় সকাল ১১টার পরিবর্তে সকাল ১০টা নির্ধারিত হলো।'

উপস্থিত সকলে এতে বিস্মিত হয়ে গেলেন। একই সঙ্গে পিতাজী নির্দেশ দিলেন, যেন কোনো রকম বিলম্ব না করে ঠিক সময়ে তাঁর শেষযাত্রা শুরু করা হয়। চারদিকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল এবং পরদিনের সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলতে লাগল।

১৯৭৬ সালের ১৩ মে ভোরেই তাঁর সহযোগী ও সঙ্গী শ্রীরাধাকিশানজী কেডিয়া, যিনি সারা রাত তাঁর পাশে বসেছিলেন, তাঁর হাতে একটি কাগজ তুলে দিয়ে পিতাজী বললেন— 'এটি আমার মৃত্যুসনদের খসড়া। বৈদ্যজীর লেটারহেডে এটি লিখিয়ে তাঁর স্বাক্ষর করিয়ে নেবেন। কারণ তখন বৈদ্যজী নিজে লিখতে পারবেন না।'

এরপর আমাকে কাছে ডেকে তিনি বললেন— 'চিন্তা করো না। পরিবারের দায়িত্ব এখন তোমার ওপর। তাই সাহসের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সমস্ত দায়িত্ব পালন করবে। সঙ্ঘের সবাই তোমাদের পাশে রয়েছে।'

তিনি চারজন ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছিলেন, যাঁরা সবসময় পরিবারের পাশে থাকবেন--- শ্রী মগনীরামজী পসারি, শ্রীবলদেব প্রসাদজী গনেড়িওয়াল, শ্রীযুগলকিশোরজী জৈথলিয়া এবং শ্রী জগদীশ প্রসাদজী শাহ।

আমি তখন পিতাজীর পাশেই বসেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন— 'তুমি একটা কাজ করো। ঘরে যে তামার কলসটি রয়েছে, সেটি নিয়ে জগন্নাথ ঘাটে যাও এবং গঙ্গাজল ভরে নিয়ে এসো। সঙ্গে গোবর, গোমূত্র, কুশ ইত্যাদিও নিয়ে এসো। গাড়ি নিয়ে যাও এবং সমস্ত কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

পিতাজীর আদেশ পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম এবং সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে ফিরে এলাম। এরপর পিতাজী তাঁর পোশাক— ধুতি, গেঞ্জি ও পৈতে পরিবর্তন করলেন। গলা থেকে রুদ্রাক্ষের মালাটি খুলে পাশের চেয়ারে রাখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছবির সামনে রেখে প্রভুকে স্মরণ করে প্রণাম করলেন।

বলদেবজী বললেন--- 'ভঁওরজী, আপনার শরীরে এত কষ্ট। এই অবস্থায় আবার পোশাক পরিবর্তন করার কী প্রয়োজন?'

পিতাজী উত্তর দিলেন--- 'আমরা আশেপাশের কোনো গ্রামে গেলেও পোশাক পরিবর্তন করি। আর আমি তো চিরকালের জন্য দীর্ঘ যাত্রায় যাচ্ছি। রুদ্রাক্ষের মালা সব বহনের খাটিয়ার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, তাই প্রভুর চরণে সমর্পণ করে দিলাম।'

এরপর পিতাজী আমাকে ডেকে বললেন, 'পরিবারের সবাইকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে বলো। পণ্ডিতজীকে ডেকে এনে তাঁকে ভোজন করাও।'

তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পণ্ডিতজীকে ভোজন করানো হলো। পিতাজী তাঁকে বরণ করে পোশাক, দক্ষিণা ও ছাতা উপহার দিয়ে প্রণাম করলেন।

পরিবারের সকলেই ভোজন করে প্রস্তুত হয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

পিতাজী তখন বললেন— 'আমি এবার চলে যাচ্ছি। কোনো চিন্তা করবে না। এই শরীর তো নশ্বর। একদিন না একদিন সকলকেই চলে যেতে হয়। আমার চলে যাওয়ার পর সংকীর্তন করবে, কান্নাকাটি করবে না। কারণ ভগবানের নামসংকীর্তন করলে যিনি চলে যাচ্ছেন, তাঁর আত্মার শান্তি হয়।'

আমার মা-ও তাঁর এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

পিতাজী তুলসী, গঙ্গাজল, দই ইত্যাদি গ্রহণ করলেন এবং হরিনাম স্মরণ করতে লাগলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে যেমন বরযাত্রী আসার আগে বরকে স্বাগত জানানো, মালাবদল, তোরণ ইত্যাদির প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়, ঠিক তেমনভাবেই পিতাজীর শেষযাত্রার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল।

মাটিতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে গোবর লেপন করা হতে লাগল। তখনও পিতাজীর চোখ খোলা ছিল। বৈদ্যজী নাড়ি পরীক্ষা করতে করতে সকলকে ইশারায় জানাচ্ছিলেন যে এবার তাঁকে খাট থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিতে হবে।

ধীরে ধীরে বহু মানুষ সেখানে সমবেত হতে শুরু করলেন।

শববহনের খাটিয়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিলেন শ্রীরাধেশ্যামজী চৌধরী। প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ এবং শ্মশানঘাটের ব্যবস্থার দায়িত্ব শ্রীশিবভগবানজী তোদি নিলেন। শ্রীগোপালজী করওয়া সংকীর্তন শুরু করলেন।

কর্মীরা পিতাজীর দেহ গোবর দিয়ে লেপা মাটির ওপর শুইয়ে দিলেন। পিতাজীর নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, চিৎপুর রোড হয়ে নিমতলা শ্মশানের উদ্দেশে শেষযাত্রা শুরু হলো।

পথেই বহু মানুষ সেই শবযাত্রায় যোগ দিতে লাগলেন। নিমতলায় পৌঁছানোর সময় হাজার হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।

শ্মশানঘাটের মাটিতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে তাঁর মরদেহ রাখা হলো। চারদিকে অসংখ্য মানুষ মাটিতে বসে পড়লেন। অন্ত্যেষ্টির আগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শ্রী কিশনলাল পাটোডিয়া সেখানে গীতাপাঠ করেন। এরপর শ্রীগোপালজী করওয়া 'রাম ধুন লাগী, গোপাল ধুন লাগী' ভজন শুরু করেন। চারদিকের পরিবেশ ভক্তিময় হয়ে উঠল এবং ভজনের ধ্বনিতে সমগ্র স্থান মুখরিত হয়ে উঠল।

চিতা সাজানো হলো। পিতাজীর নশ্বর দেহটি অন্ত্যেষ্টির জন্য চিতায় তোলা হলো। উপস্থিত সকলেই তাঁকে প্রণাম করে, অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৯৭)
কাকতালীয়

পুণার অধিকারী শিক্ষণ বর্গ (ওটিসি) (১৯৪০ এপ্রিল) শেষ হলে মহারাষ্ট্রের কার্যকর্তাদের বৈঠক শেষ করে ডাক্তারজীর ১৫ মে নাগপুর যাওয়ার দিন স্থির হলো। সেই অনুসারে ১৪ মে রাতে 'নতুন মারাঠী বিদ্যালয়'-এ স্বয়ংসেবকদের কাছে বিদায় গ্রহণের একটি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে স্বয়ংসেবকেরা ডাক্তারজীকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে সকলের সংগৃহীত কিছু অর্থের অর্ঘ্যদানে সম্মানিত করে। অনুষ্ঠানে কয়েকজন স্বয়ংসেবক ভাষণও দেয়। এই বক্তৃতা প্রদান পর্বে অনভ্যস্ত হওয়ায় একজন স্বয়ংসেবক ভুল করে বলে ফেললো— 'আমরা ডাক্তারজীকে শেষ বিদায় জানাচ্ছি'। তার এই কথা শুনে সবাই বিচলিত হয়ে পড়ে কিন্তু ডাক্তারজী হাসতে থাকেন (তিনি কি এই সত্য অনুভব করতে পারছিলেন!)। পরে বুঝতে পেরে সেই স্বয়ংসেবকও খুব সংকুচিত হয়ে পড়েছিল।

পরে বিদায় জানাতে স্বয়ংসেবকদের আগমনে পুণা স্টেশন লোকারণ্য। প্রান্ত সঙ্ঘচালক স্বয়ংসেবকদের মুখোমুখি দুটি সারিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ডাক্তারজী স্টেশনে পৌঁছলে এই দুই পঙ্ক্তির মাঝখান দিয়ে স্বয়ংসেবকদের নিরীক্ষণ করতে করতে কামরার দিকে এগোতে থাকেন এবং কামরার কাছে গিয়ে কার্যকর্তাদের সঙ্গে ডাক্তারজী স্বভাবসুলভ হাস্য পরিহাস করছিলেন। এর মাঝেই ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বেজে উঠলো। ধীর গতিতে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ডাক্তারজী ট্রেনে উঠে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর ছড়িটি আকাশের দিকে তুলে সকলকে নমস্কার জানিয়ে বেশ জোরে, সবাই যাতে শুনতে পায়— বলে উঠলেন— 'এই দেখ আমি চললাম'। শত শত স্বয়ংসেবক স্টেশনে দাঁড়িয়ে দৈববাণীর মতো সে কথা শুনতে পেল। সবার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। সত্যি ডাক্তারজী চলে যাচ্ছেন। তাঁর সেই প্রসন্ন মুদ্রার মূর্তি ক্রমশ দূর থেকে দূরে এগিয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল। শত শত স্বয়ংসেবক চোখ মুছতে মুছতে স্টেশন ত্যাগ করলো।

(৯৮)
প্রস্তুতি

পুণার অধিকারী বর্গ (ওটিসি) সমাপ্ত হলে শ্রীগুরুজী এবং অন্যান্য স্বয়ংসেবক কার্যকর্তারা ডাক্তারজীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। অত্যধিক পিঠে ব্যথা, জ্বর থেকে কোনো রকম উপশমের উপায় পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত চিকিৎসারত ডাক্তারদের পরামর্শে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসারে শরীরের নানা পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য ডাক্তারজীকে মেয়ো হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। বিভিন্ন স্থান থেকে স্বয়ংসেবকদের জলবায়ু পরিবর্তন ও চিকিৎসার জন্য বাইরে নিয়ে যাবার আহ্বান আসছিল কিন্তু শরীর এত দুর্বল ছিল তাঁকে কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তারজীর হাসপাতাল ভালো লাগছিল না। নানারকম কার্যকর্তারা হাসপাতালে ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। একদিন শ্রী যাদব রাও জোশী ডাক্তারজীর পাশে এসে বসলে হঠাৎ ডাক্তারজী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন—'সঙ্ঘের বরিষ্ঠ অধিকারীর দেহাবসান হলে আপনারা তাঁর অন্তিম সংস্কার সামরিক পদ্ধতিতে করবেন কি?' এমন অপ্রিয় প্রসঙ্গ ভালো লাগার কথা নয়। যাদবরাওজী উত্তর এড়িয়ে ওষুধ খাবার কথা বললেন। কিন্তু ডাক্তারজী সে কথায় কান না দিয়ে তাঁর প্রশ্নের সূত্র ধরে বললেন— 'সঙ্ঘ এক বিশাল পরিবার, কোনো সামরিক সংগঠন নয়। অতএব পরিবারের কর্তার মৃত্যুর পর যেভাবে অন্তিম সংস্কার করা হয়, সেই ভাবেই সাদাসিধে তথা সাধারণ পদ্ধতিতে হওয়া উচিত'।

ডাক্তারজীর জ্বর ১০৩-১০৪ ডিগ্রির নীচে নামছিল না। চোখে ঘুম নেই। খুব কষ্ট বোধ করছিলেন ডাক্তারজী। ২০ জুন সকালে চিকিৎসারত তিনজন ডাক্তার সিদ্ধান্ত নিলেন মেরুদণ্ড থেকে জল বের করে দিতে হবে। ডাক্তারজী সব শুনে শারীরিক সংকটাবস্থার কথা বুঝতে পারলেন। তিনি ডাক্তারদের ডেকে বললেন— 'আপনারা কিছু করার আগে আমার একটু সময় দরকার'। ডাক্তারজীর মুখমণ্ডলে তখন গভীর চিন্তার ছাপ। তিনি শ্রীগুরুজীকে তখন কাছে ডাকলেন। অন্যান্য কার্যকর্তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলের সামনে ডাক্তারজী ঘোষণা করলেন— 'এখন লাম্বার পাংচার করার সময় এসে গেছে। আমি যদি বেঁচে যাই তাহলে ঠিক আছে। নইলে এরপর সঙ্ঘের সমস্ত দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করবেন'। এরকম অন্তিম যাত্রার ভাষা শুনে শ্রীগুরুজী খুব শোকার্ত হয়ে বললেন— 'ডাক্তারজী আপনি এ কী কথা বলছেন? আপনি শীঘ্রই সেরে উঠবেন'। ডাক্তারজী স্মিত হেসে বললেন— 'ঠিক আছে, কিন্তু আমি যে কথা বললাম, সেকথা অবশ্যই মনে রাখবেন'। এ যেন বাইরে বেড়াতে যাওয়ার আগে ঘর-দুয়ার ঠিকঠাক গুছিয়ে রেখে যাওয়া।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩৩

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোটো গল্প
প্রবন্ধ

সত্বর আপনার কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা